# দিগ্‌দর্শন

# দিগ্‌দর্শন

সুমন্ত সোম

অ্যাকাডেমিকা
কলিকাতা-১২

পরিবেশক ঃ অ্যাকাডেমিকা
ও
প্যালব্রাদার্স
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পি ঃ নীরেশ পোদ্দার
( মে কুইন এণ্ড কোম্পানী )
কলিকাতা-১

গ্রন্থমণি, ১৯ নাজির বাগান, হালতু, ২৪ পরগণা হইতে পি, বানার্জী কর্তৃক প্রকাশিত ও
শঙ্কর প্রেস, ৩৭/১/১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীমনোরঞ্জন
নায়ক কর্তৃক মুদ্রিত 

দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই লেখকের বিস্ময়কর সৃষ্টি

পাথরের দেওয়াল ( যন্ত্রস্থঃ )

গ্রামের নাম শালুকপুর। ঐ নামেই রেল-ষ্টেশন। রেলষ্টেশন থেকে একটি পাকা পথ নেমে এসেছে বরাবর। তারপর বাঁ দিকে একটি দীঘি রেখে দক্ষিণের দিকে বেঁকেগেছে রাস্তাটি। এমনি ভাবে পথটি গেছে বহুদূর। মিলেছে গিয়ে অন্য এক গ্রামে। আর এইখানেই শেষ হয়েছে গ্রামের বৈদ্যুতিক বাতি গুলো। তারপর আর এগোয়নি। কথা চলছে এবারে বৈদ্যুতিক বাতি গুলো আরো এগিয়ে যাবে। কারণ ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তারা এদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

শালুকপুরে আজ বৈদ্যুতিক এসেছে বছর পাঁচেক। এর আগে এখানে তেলের প্রদীপ জ্বলতো। তাই অনেক লেখালেখি করে, তবে এখানকার লোকেরা বৈদ্যুতিক আলো পেয়েছে।

এরজন্য গ্রামের পূর্ব্বতন জমিদার সুরেন দত্তর চেষ্টা ছিল অপরিসীম। এখন তিনি গ্রামে থাকেন না। জমিদারী উচ্ছেদের আগে থেকেই তিনি কলকাতায় চলে গেছেন। সেখানেই তিনি শুরু করেছেন নূতন জীবন।

মাঝে মাঝে তিনি দেশে আসেন বিশ্রাম নিতে। দিন কয়েক থেকে আবার তিনি চলে যান কর্ম্মস্থলে। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে তার মেয়ে মানসী আসেনি গ্রামে।

শালুকপুরে পড়ে থাকে তার নির্জন প্রাসাদ। আগের মত এখন আর প্রাসাদের গেটে তক্‌মা আঁটা ভোজপুরী দারোয়ান থাকে না। আর থাকবার দরকারও হয়নি। অনেকদিন আগেই তারা একে একে বিদায় নিয়েছে। অনাবশ্যক ঘর গুলোতে এখন বড় বড় তালা লাগান। মাসে দু'একবার বোধহয় ঘর গুলো খুলে পরিষ্কার

করা হয়। আর তার সাথে আসবাব পত্র গুলোও মোছা হয়। আর দুর্গা পুজার সময় কেবল ঘরের সমস্ত বেলয়ারীর আলোর ঝাড় গুলো জ্বালানো হয়।

ঐ সময়টায় কেবল দত্তবাড়ীর প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। গ্রামের পাঁচজন এসে তখন ভীড় জমায় খুশী মনে। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির জন্য তারা এগিয়ে আসে খবরাখবর নিতে। তারপর সাড়া বছর নির্জীব। বিরাট প্রাসাদ শুধু কেবল অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে. নিঃশব্দে।

সরকারী অফিস থেকে চিঠি এসেছে, বাড়ীটি তারা দখল করে নেবে। এখানে খোলা হবে গ্রামের কো-অপারেটিভ অফিস। যেমন অন্যান্য গ্রামে জমিদারদের বড় বড় বাড়ী গুলোতে খোলা হয়েছে অপিস গুলো।

কিন্তু সুরেন বাবু অনেক চেষ্টা করে বাড়ীটি এখনও দখলে রেখেছেন। যদিও তিনি নিশ্চিত জানেন, একদিন সরকারের হাতে বাড়ীটি তুলে দিতে হবে সামান্য ক্ষতি পুরণে।

বাড়ীটিতে মনিব বলতে আছেন শুধু পিসিমা। তিনি মানসীর বাবার চেয়ে বড়। বিয়ে হবার বছর তিনেক বাদে তার স্বামী মারা যান। তারপর থেকেই তিনি শালুকপুরে আছেন।

এরপর মানসীর মা মারা যান। তখন দত্তবাড়ীর সংসার একেবারে শূন্য। তখন সুরেন বাবুর স্বজনেরা বলেছিলেন, আবার বিয়ে করতে।

কিন্তু তিনি রাজী হননি। তাই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তখন পিসিমাই নিজ হাতে তুলে নিলেন।

মাঝে মাঝে পিসিমার শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক আসতো নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন কঠোর ভাবে। কারণ সেখানে তিনি কি নিয়ে থাকবেন।

নিজের ছেলে-মেয়েও নেই। আর তেমন হৃদ্যতাও নেই সেখানে। শুধু থাকা, খাওয়া আর ঘুমানো। আর একটা ব্যর্থ জীবনের উপলব্ধি নিয়ে চলা ফেরা করা।

বরং এখানেই তিনি ভাল আছেন। নানা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে, তিনি তার অপুর্ণ বিবাহিত জীবনের স্মৃতি ক্রমশ ভুলে গেছেন।

কলকাতা থেকে সুরেন বাবুর চিঠি পেয়েছেন পিসিমা। এবার পুজোয় তিনি মানসীকে নিয়ে গ্রামে আসছেন।

কিন্তু এই চিঠির উপর পিসিমা তেমন ভরসা রাখেন না। কারণ এমন চিঠি পুজোর আগে তিনি অনেকবার পেয়েছেন। তারপর অনেক আশা নিয়ে দিন গুনেছেন। অবশেষে দেখা গেছে সুরেন বাবু একাই এসেছেন গ্রামে। সঙ্গে মানসী আর আসেনি। ও থেকে গেছে কলকাতায়। অথবা কলেজের বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গেছে দূর দেশে।

মেয়ের এমন ইচ্ছেতে সুরেন বাবু কোনদিন বাধা দেননি। আর তা তিনি পারেন না। সেই ছোট বেলা থেকে মাকে হারিয়েছে। বড় হয়েছে পিসিমার কোলে।

তারপর মেয়েকে পড়াশুনার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসলেন। ধীরে ধীরে আরো বড় হলো। কথায় আর ব্যবহারে ফুটে উঠল এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। যা খুব কমই দেখা যায় অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে।

তাই সুরেন বাবুর গভীর বিশ্বাস মেয়ের উপর। যে বিশ্বাস কোনদিনই হয়ত ভাঙ্গবে না তার জীবনে।

মাঝে মাঝে মানসীর বাবা বলতেন, দেশের সম্পর্ক কি একেবারে ছেড়ে দিলি মানসী। অন্ততঃ পুজোর ছুটিতে তো একবার ঘুরে আসতে পারিস।

বাবার কথা গুলি মানসীর মন্দ লাগেনি। কিন্তু সেখানে একা একা ওর কতদিন ভাল লাগবে। খুব জোর দিন সাতেক। তার পরই তো সেই একই অবস্থা। মন তখন আবার কলকাতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে।

মানসীর মন চায় কোলাহলে থাকতে। আর বিশ্রাম চায় নির্জনে। কিন্তু নির্জন পরিবেশকে উপভোগ করার জন্য অন্ততঃ জনকয়েক তো

মনের মত সঙ্গী থাকা প্রয়োজন। নতুবা এই পরিবেশকে যেন পুরোপুরি ভোগ করা যায় না। কোথায় যেন সেই নির্জন পরিবেশের শূন্যতাকে পুরণ করার অভাব থেকে যায়।

তাই মানসী কোনদিনই একা নির্জন স্থানে যেতে পারেনি। বোধ হয় ওর মনের মত সঙ্গী পায়নি বলে। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু এ'বছর।

মানসীর বাবা বার বার বলেছেন। এবারের ছুটিতে দেশ থেকে ঘুরে আয়। সেই কবে গিয়েছিলি। আর দেশে গেলি না। আর তোর পিসিমাই কি ভাববেন। তারও তো তোকে দেখতে ইচ্ছে করে। আর ক'দিন সে একা বাড়ীঘর দেখবে।

এই কথার পর মানসী স্থির করছিল। এবারের ছুটিটাও দেশের বাড়ীতে কাটিয়ে আসবে। আর এবার ও ঠিক তাই করেছে। তাই পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছে নিজেদের গ্রামে।

পিসিমা ভাবতে পারেননি, মানসী যে সত্যি দেশে আসবে। তাই সেদিন যখন ও সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত হলো, পিসিমা আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মানসীকে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আজ মানসী দেশে এসেছে। তবুও গ্রামের অনেক স্মৃতি ওর আজও মনে আছে। কিন্তু সেই স্মৃতির সাথে গ্রামের যেন অনেক মিল নেই। তাই আজ গ্রামের পরিবেশকে অনেক নূতন বলে মনে হলো।

মানসী লক্ষ্য করল, আগের মত গ্রামে আর সেই নির্জনতা নেই। আর ঘন বন জঙ্গলের চিহ্নও নেই। চারিদিকে বেশ কোলাহল পুর্ণ। লোকের বসতি অনেক বেড়েছে। রাস্তাঘাটও কিছু পাকা হয়েছে। দিনে ষ্টেশন থেকে বাস চলে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাইকেল রিক্সো চলে। কেমন যেন সব কিছুতে এক গতিশীলতার চিহ্ন।

পিসিমা আগ্রহভরে গ্রামের উন্নতির কথা বললেন। এখন আর গ্রামের লোকেরা শুধু চাষ করে দিন কাটায় না। কলকারখানার

দিকে তাদের নজর পরেছে বেশী। কারণ সেখানে জীবিকার নিরাপত্তাটা অধিক।

পিসিমার এই কথা শুনে মানসী অত্যন্ত বিস্মিত হলো। কারণ এই কথাটি যে ভারতের অর্থনীতির এক গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। আর এর উপর কলেজের অধ্যাপক কত বড় বড় নোট দিয়েছেন। সেগুলি যে আজও মানসীর বিস্মৃতি ঘটেনি।

তাই মানসীর মনে প্রশ্ন জাগলো। পিসিমাই বা কি করে জানলেন এই সমস্ত তথ্য।

মানসী জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা পিসিমা তুমি একথা কি করে জানলে ?

পিসিমা সবিস্ময়ে বললেন—কেন রে ? এযে চোখের সামনে ঘটছে। তারপর আজকাল খবরের কাগজ গুলো যে একথাই বড় বড় করে লিখছে। নিত্য নূতন পথকে আমাদের ধরতে হবে। নইলে প্রগতির পথে আমরা যে অনেক পিছিয়ে পড়বো।

মানসী এমন যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আশ্চর্য হলো। তবুও জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, তুমি প্রগতি বলতে এখানে কি ইঙ্গিত করছো।

—কেন প্রগতি মানে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন। পুরনো সব কিছু সংস্কার ভেঙ্গে চুড়ে একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি হওয়া। আর সেই আবর্ত হবে মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষকে পথ দেখাবে বাঁচবার জন্য।

মানসী এবার চুপ করে গেল। বাস্তবিক ও আশা করতে পারেনি পিসিমার মুখ থেকে এমন সুন্দর কথা গুলো শুনবে।

ও ভেবেছিল পিসিমা বোধহয় আরো পাঁচটা বাড়ীর বৃদ্ধার মত দিন কাটায়। তাই ও পিসিমার মুখ থেকে আশা করেছিল, দিনে কতবার মালা জপ করতে হয়। অথবা কতবার দিনে আহ্নিক করতে হয়।

॥ ২ ॥

একদিন দুপুর বেলায় পিসিমা মানসীকে বললেন—গ্রামের ছেলেরা আজকাল পড়াশুনায় এগিয়ে যাচ্ছে। আর তারা পড়ার সুযোগ-সুবিধে পেলে আরো এগিয়ে যাবে দিনে দিনে।

পরক্ষণে পিসিমা আবার বললেন—এই তো ঐ বাড়ীর সুজয় পর পর তিনটে পাশ করল।

মানসী কথাটি টেনে নিয়ে বলল—কি পাশ ?

পিসিমা কপালটি কুঁচকে বললেন—কি পাশ তা তো মনে নেই। তবে শুনেছি, কলেজের পড়া ওর শেষ হয়েছে। এবার কলকাতায় গিয়ে পড়বে।

এবার মানসী বুঝতে পারলো ইউনিভারসিটি গ্রাজুয়েট কোর্সের তিনটির মধ্যে একটি ডিগ্রি পেয়েছে সুজয় নামে ছেলেটি। তাই মানসী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোন বাড়ীতে থাকে ?

পিসিমা আগ্রহভরে বললেন—ঐ তো পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে টিনের চাল দেওয়া বাড়ীটায় থাকে।

পিসিমা এমনভাবে বললেন—যেন পুকুর আর সুজয়দের বাড়ীটা সত্যি খুব কাছে।

তারপর মানসী আর প্রশ্ন করেনি। এবার হয়তো প্রশ্ন করলে, আতিশয্য একটু বেশী প্রকাশ পেতো। আর পিসিমাই কি ভাববেন। তাই আরো কিছু জানবার ইচ্ছে থাকলেও মানসী চুপ করে গেল।

পুজোর দিন দুয়েক আগে গ্রামের ছেলেরা প্যাণ্ডেল করছিল। তাই দেখে মানসী পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করল—কই পিসিমা ওরা আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নিলে না ?

—চাঁদা সরকার মশাই দেন। আর ছেলেরা তা ঠিক সময় এসে চেয়ে নেয়।

কিন্তু মানসী আশা করছিল। গ্রামের ছেলেরা ওর কাছে এসে চাঁদা চাইবে। আর মানসীও বেশ কিছু মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে ওদের সকলকে অবাক করে দেবে।

এদিকে গ্রামের ছেলেরাও মানসীকে নিয়ে কম গুঞ্জন করেনি। ওদের মধ্যে খাদু বলেছে—এবার পুজোটা মাইরী বেশ জমবে। স্বয়ং দত্তবাড়ীর মানসী দেবী উপস্থিত। এবার আমাদের একটা কিছুকরা চাই। শুধু পুজো করলে চলবে না। এর সাথে আরো কিছু করে, মানসী দেবীকে অবাক করে দেবো।

খাদুর বন্ধু ভ্যাবলা বলল—ঠিক বলেছিস। এবারে অষ্টমীর দিন আমরা নিমাই সন্ন্যাস পালা দেবো।

ভ্যাবলার কথা শুনে হারু হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—তুই এখনও গেঁয়ো ভূত রয়ে গেলি ভ্যাবলা। মানসী দেবী কি নিমাই সন্ন্যাস পালা দেখলে খুশী হবে। একটা অতি আধুনিক কিছু করতে হবে, যা দেখে মানসী দেবী যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠবেন।

খাদু একটু বিরক্ত হয়ে বলল—দূর ওসবের কাজ নেই। বরং মানসী দেবীকে আমরা সবাই গিয়ে বলি, আপনি যখন এবার গ্রামে রয়েছেন। তখন আপনি আমাদের মধ্যে এসে একটা গান বাজনার ব্যবস্থা করুন।

হারু উৎসাহিত হয়ে বলল—তা মন্দ নয়। কিন্তু বলবে কে ?

খাদু বলল—কেন সুজয় রয়েছে। ও গিয়ে বললে। আর এ সমস্ত ব্যাপার ও খুব ভাল গুছিয়ে বলতে পারে।

হারু ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলল—একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিস ? মানসী দেবী আসার পর থেকে, সুজয় কেমন পুজোর ব্যাপার থেকে সরে যাচ্ছে।

সকলে এবার হারুর কথাটি ভেবে দেখল।

সত্যি কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়। অন্য বছর সুজয় নিজেই গরজ করে সব কাজ দেখে শুনে করে। আর এবার শুধু পুজোর জায়গায় ওকে বার দুয়েক দেখা গেছে। তাই রাত্রির দিকে ওরা তিনজনে সুজয়ের বাড়ী গেল।

সুজয় তখন রাত্রির খাওয়া সেরে একটি চেয়ারে বসেছিল। হাতে একটি রবীন্দ্র রচনাবলী। তার পাতাগুলো অন্যমনস্কভাবে একের পর এক উল্টে যাচ্ছিল। আর কোন পাতায় ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো না।

কেবল মনে হতে লাগল, এ বছর পুজোটা ওর মাটি হয়ে গেল। তাছাড়া পুজোর কতগুলি কাজের দায়িত্ব ছিল। সেগুলিও শেষ করতে পারল না। কেমন যেন অকস্মাৎ সব কাজে বাধা এসে পড়ল।

এমনি সময় ওরা তিনজন এসে উপস্থিত হলো। সুজয় ওদের দেখে বিস্মিত হয়ে বলল—কিরে এত রাত্রিতে ?

হারু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—আচ্ছা তোর ব্যাপার কি বলতো ? সেই সকালে একবার প্যাণ্ডেলে গিয়েছিলি। তারপর আর একবারও গেলি না। এত কাজ শুধু আমাদের দ্বারা হয়।

সুজয় কথাটি সামান্য লঘু করে বলল—কেন প্যাণ্ডেল হয় নি ?

খাদু বলল—প্যাণ্ডেল হবে না কেন। কিন্তু শুধু প্যাণ্ডেল হলেই কি চলবে। এবারে সুরেনবাবু আর তার মেয়ে গ্রামে রয়েছেন। তাই পুজোটাকে এবার জাঁক জমক করে করতে চাই। সেজন্য আমরা ঠিক করেছি, অষ্টমীর দিন একটা জলসা করবো। আর তুই এই ব্যাপারটা মানসী দেবীকে গিয়ে বলবি। যাতে উনি আমাদের মধ্যে থেকে, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন।

সুজয় নিঃসঙ্কোচে বলল—আমাকে মাপ কর ভাই। আমি এ সমস্ত ব্যাপার কিছু বলতে পারব না।

খাদু বলল—আচ্ছা তুই আমার গ্রামের প্রেষ্টিজটা রাখবি না ?

—এতে প্রেষ্টিজের কি আছে। যে কেউ গিয়ে, বললেই তো হয়।

—আরে তা যদি পারতাম। তাহলে তোকে এত রাত্রিতে জাগাতে আসতাম না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা সুজয়কে রাজী করাতে পারলো না। তাই ওরা পরদিন দলবেঁধে মানসীদের বাসায় গেল।

দরজায় পিসিমার সাথে ছেলেদের দেখা হলো। বরাবরই তিনি গ্রামের ছেলেদের স্নেহ করেন। তাই তিনি সাদরে ছেলেদের নিয়ে ঘরে বসালেন।

ওদের মধ্যে হারু বলল—দেখুন পিসিমা এবার পূজায় আমরা একটা জলসা করবো। তাই এই বিষয়ে মানসী দেবীকে বলতে এসেছি।

—বেশ তো বাবা। তোমরা বস। আমি এখুনি মানসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ওদের মধ্যে সব কথা ঠিক ছিল। মানসী এলে কে কি বলবে। তাই কথাগুলো ওরা খুব মনযোগের সাথে স্মরণ করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানসীর উপস্থিতিতে সকলের গলা শুকিয়ে গেল।

ভ্যাবলা প্রথমেই মুখটা জানালার দিকে ফিরিয়ে রাখল, যাতে ওকে কোন কথা বলতে না হয় মানসীর সাথে।

এমন পরিস্থিতিতে মানসীও বেশ অস্বস্তি বোধ করল। শেষে খাদু হারুর দিকে চেয়ে কোন রকমে বলল—তুই বল হারু।

হারু জিভ দিয়ে গলা ভিজিয়ে বলল—তুই বল খাদু। শেষ পর্যন্ত খাদুই কোন রকম প্রস্তাবটি বলল।

প্রস্তাব শুনে মানসী খুব খুশি হয়ে বলল—বেশ তো আপনারা ব্যবস্থা করুন। এর জন্য যা খরচ হয় আমি দেবো।

ছেলের দল বেশ খুশী হয়ে মানসীদের বাসা থেকে বেরিয়ে এলো আর খাদু বুক ফুলিয়ে বলল—দেখলি মানসী দেবীর সাথে কেমন কথা বললাম।

ভ্যাবলা কথাটি সহ্য করতে পারল না। তাই বলল—খুব হয়েছে। আর বলিস না খাদু। এ শর্ম্মা যদি না থাকতো। তাহলে মানসী দেবী মোটেই রাজী হতো না।

—বটে তুই ভাবছিস, তোকে দেখে মানসী দেবী খুব মুগ্ধ হয়েছে। তাও যদি নিজে কথা বলতিস। মুখ তো ভয়ে ভয়ে আগেই জানলার দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলি।

ভ্যাবলা ঈষৎ রেগে গিয়ে বলল—মুখ কেন ফিরিয়ে রেখেছিলাম, সে তুই কি করে বুঝবি। মেয়েদের সম্বন্ধে কোন সাইকোলজির নলেজ থাকলে, তুই একথা বলতিস না।

কথাটি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ করে দিলো খাদুকে।

তারপর খাদু বলল—ঠিক বলেছিস। মানসীদেবীর সাইকোলজি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তুই কবি মানুষ। তোর দৃষ্টি আলাদা। তুই সহজে মানুষকে চিনতে পারিস।

যাক এতদিনে তুই পুঁটিরাণীকে নিয়ে কাব্য লিখেছিস। এবারে মানসী দেবীকে নিয়ে কাব্য লেখ।

ভ্যাবলা এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—দেখ্ খাদু, তোকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুই এমন পার্শন্যালি হিট্ দিয়ে কথা বলবি না।

খাদুও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—কেন তুই মারবি নাকি?

এর পরের কথাটি আর এগোল না। হারু ওদের উত্তেজনা লক্ষ্য করে বলল—আচ্ছা খাদু তোরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কি পুজোটাকে মাটি করে দিবি। আর এভাবে যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিস, তাহলে আজ থেকে আমি আর তোদের মধ্যে নেই।

হারুর এমন দৃঢ় কথার বেশ কাজ হলো।

ভ্যাবলা এবার গলা নামিয়ে বলল—ঝগড়া তো ঐ বাধালো। কি দরকার ছিল মানসী দেবীর নাম বলার।

থাদু এবার আর প্রতিবাদ করল না। বরং খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল—দোষ আমারই হয়েছে ভ্যাবলা। আমি তোর কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

॥ ৩ ॥

পঞ্চমীর দিন মানসীর বাবা এলো কলকাতা থেকে। ব্যবসার কাজের জন্য তিনি মেয়ের সাথে আসতে পারেননি। তাই মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন নায়েব মশাইয়ের সাথে। আর নায়েব মশাই তখন জরুরী কাজের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন।

মানসী আপত্তি করেছিল একা আসতে। কিন্তু সুরেনবাবু জানতেন, মেয়ের যদি পরে মত পরিবর্তন হয়, তাহলে এবারও ওর যাওয়া হবে না দেশে। তাই মানসীর যাবার ইচ্ছেটা প্রবল থাকতে থাকতেই মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নায়েবের সাথে।

সুরেনবাবু গাড়ী থেকে নেমে দেখলেন—বাড়ীর পুরনো ভৃত্যটি দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে ভৃত্যটি এগিয়ে গেল জিনিষ পত্র তুলতে।

একে একে সমস্ত জিনিষগুলো কুলীর মাথায় তুলে দিয়ে ভৃত্যটি এগিয়ে চললো সুরেনবাবুর সাথে।

পথে সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বাসার সব ভাল আছে ?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু।

—দিদিমণি ?

—উনি তো আরো ভাল আছেন। আজ সকালে উনি নিজের হাতে আমাকে পাঁচ টাকা বকশিস্ দিয়েছেন।

—কেন ?

—বাজার থেকে দু'টো কদবেল এনে দিয়েছিলাম বলে। আমি

বুঝেই পেলাম না, কদবেল দুটোর মধ্যে কি ছিল। দিদিমণি বললেন—এমন কদবেল নাকি তিনি অনেককাল খাননি। তাই তিনি খুশী হয়ে পাঁচটাকা বকশিস্ দিয়েছেন।

গেটের পাশে পিসিমা দাঁড়িয়েছিলেন। সুরেনবাবু পিসিমাকে প্রণাম করে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে মানসীও ছিল।

সুরেনবাবু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগছেরে এখানে?

মানসী মৃদু হেসে বলল—খুব ভাল বাবা।

সুরেনবাবু সুপ্রসন্ন মনে বললেন—ভালো তো লাগতেই হবে। এটা যে নিজের দেশের মাটি। এ কখনও খারাপ হতে পারে না।

রাত্রিতে খাওয়ার টেবিলে মানসী বাবাকে গ্রামের ছেলেদের আগমনের সংবাদটা জানালো।

সুরেনবাবু হেসে বললেন—বেশ তো। এবারে পুজোটা ভাল করেই হোক। আমি নিজে গিয়েই টাকাটা দিয়ে আসবো।

ষষ্ঠীর দিন সুরেনবাবু নিজেই পুজামণ্ডপে গেলেন। পুজোর উদ্যোক্তাদের ডেকে তিনি দু'শো টাকার চাঁদা দিলেন। যাতে আমোদ ফুর্তি আর ভোগ বিতরণের কোন অসুবিধা না হয়।

সপ্তমী কাটলো। অষ্টমীর দিন সকাল থেকে ভীড় বাড়ল। মানসী অঞ্জলী দেবার জন্য মণ্ডপে এসে উপস্থিত হলো। ছেলেরা তখন মণ্ডপে দল বেধে গল্প করছিল।

তাদের মধ্যে ভ্যাবলা প্রথমে মানসীকে দেখতে পেয়ে, প্রায় ছুটে এসে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় অভ্যর্থনা জানালো।

মানসী সলজ্জ ভাবে ছেলেদের বলল—ঠাকুর খুব ভাল হয়েছে।

কথা শুনে ওদের বুক গুলো গর্বে ফুলে উঠল।

ভ্যাবলা সোৎসাহে বলল—জানেন মানসী দেবী, এবার আপনি গ্রামে আছেন বলে, আমি খুব খুশী হয়েছি।

খাদু কথাটি শুনে ভ্যাবলাকে চিমটি কাটলো। তারপর মৃদু হেসে খাদু বলল—আঁমরা সবাই খুশী হয়েছি মানসী দেবী। ও শুধু একা নয়।

মানসী বুঝতে পেরেছিল ওদের মনগুলোকে। কিন্তু তবুও ওদের এই নিতান্ত ছেলেমানুষী আচরণে ও মোটেই ক্ষুব্ধ হয়নি। বরং ওদের কথা বলার ভঙ্গী দেখে একটি নির্মল কৌতুক বোধ করছিল মনে মনে।

এমনি সময় মানসী একটি যুবককে আসতে দেখলো একজন প্রৌঢ়ার সাথে। তাদের দু'জনার চেহারায় যথেষ্ট মিল রয়েছে। মানসী আরো লক্ষ্য করল, যুবকটি চেহারায় আর লম্বায় যেন এই গ্রামের সকলের চেয়ে পৃথক।

গায়ের রঙ তার ফর্সা। মাথার চুল গুলো ঘন কৃষ্ণ বর্ণ। আর চোখে মুখে এক প্রখর বুদ্ধি দীপ্তের ছাপ।

ছেলেরা ওকে প্রথমে দেখতে পেলো না। সে প্রৌঢ়ার সাথে অঞ্জলী দেবার জন্য এগিয়ে গেল মণ্ডপের দিকে।

এবার মানসীর মনে পিসিমার কথাটি মনে পড়ল। তাহলে এই কি সুজয় যে এ'বছর গ্রাজুয়েট হয়েছে।

মানসী গোপন দৃষ্টিতে বার কয়েক তাকাল সুজয়ের দিকে। সুজয়ের সুদর্শন চেহারা মানসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

কিন্তু মানসীর দৃষ্টিতে সামান্য উপেক্ষার ভাব ছিল। কারণ আজ পর্য্যন্ত ও কোন ছেলের দিকে দু' একবারের বেশী তাকায়নি। আর সেই তাকাবার মধ্যে থাকতো যথেষ্ট উপেক্ষার ভাব। তাই আজও সেই উপেক্ষার ভাব থাকলেও মানসী আর তা ধরে রাখতে পারল না মনে।

কিন্তু পরক্ষণে মানসীর মনে একটি প্রশ্ন জেগে উঠল। সুজয় কেন গ্রামের ছেলেদের মধ্যে নেই। ও তো এই গ্রামেই থাকে। তবে কেন এমন ভাব নিয়ে আছে। না গ্রামেতে গ্রাজুয়েট হয়েছে বলে, এটা ওর অহঙ্কার।

ইতিমধ্যে হারু সুজয়কে দেখতে পেয়ে জোর করে টেনে আনলো দলের মধ্যে। তারপর মানসীর সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য বলল—মানসী দেবী, এর নাম সুজয় রায়। আমাদের বন্ধু।

সুজয় সৌজন্যতা বশতঃ হাত তুলে নমস্কার জানালো। মানসীও নমস্কার জানিয়ে বলল—কই এর আগে তো দেখেনি ?

হারু কথাটির কি জবাব দেবে ভাবছিল।

কিন্তু সুজয় কথাটির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম এক তীব্র অপমান বোধ করল। তাই বলল—আগে দেখবার প্রয়োজন হয়নি, তাই দেখেননি।

এমন একটা আচমকা জবাব পাবে। মানসী তা ভাবতে পারেনি। আর তাছাড়া ভাববার তো কোন কারণ ছিল না। ও কথাটি বরং সহজ করেই বলেছিল। তাই মানসী এখন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু সুজয় আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়ালো না। মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেল অঞ্জলী দেবার জন্য। তারপর অঞ্জলী দিয়ে সুজয় মাকে নিয়ে ফিরে গেল বাড়ীর দিকে।

মানসী চলে যাবার পর, খাদু রেগে বলল—সুজয়ের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। দুম্ করে যাকে তাকে একটা কথা বললেই হলো।

ভ্যাবলা অনুযোগের সুরে বলল—উনিতো এমনি দেশে আসেন না। তারপর এমন ব্যবহার পেলে, কেমন একটা ব্যাড আইডিয়া নিয়ে যাবে বলতো।

হারু বলল—যাক গে, যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য ভেবে আর লাভ নেই। এখন আমাদের জলসাটা যাতে ভাল হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে।

সন্ধ্যার দিকে মণ্ডপে প্রচুর লোক হলো। কারণ সচরাচর এখানে তেমন জলসা হয় না। তাই জলসার নাম শুনে, অন্য গ্রাম থেকেও লোক এসেছে প্রচুর। আর যারা পুজোর ছুটিতে বাড়ী এসেছিল, তারাও খুশী মনে ভীড় জমিয়েছে জলসার আসরে।

কিন্তু গান তেমন জমলো না। কয়েক জনের গানের শেষে সুরেন বাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। মানসীরও ইচ্ছে করছিল, বাড়ী চলে যায়। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ওকে বসতে হলো।

গ্রামের ছেলেরা বুঝলো, জলসা ওদের আপ সেট হয়েছে। ভাল ভাল যে কয়জন শিল্পীর আসার কথা ছিল। তারা শেষ পর্য্যন্ত এলো না।

জন কয়েক ছেলে সুজয়কে দেখতে পেলো। সুজয় তখন ভীড়ের এক কোনায় চুপ করে দাড়িয়ে গান শুনছিল। খাদু তৎক্ষণাৎ ভীড় ঠেলে সুজয়কে ধরে আনলো গান গাইবার জন্য।

সুজয় প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল—আমি কোনদিন মাইকে গাই-নি। শুধু শুধু ষ্টেজে উঠে লোক হাসাবো।

হারু বলল—তুই যেমন পারিস গিয়ে গান গা। অন্ততঃ আমাদের সময়টা তো কাটাতে হবে। এতগুলো লোক এসে জমা হয়েছে। তারাই বা কি বলবে।

খাদু তৎক্ষণাৎ সুজয়ের নামটা মাইকে ঘোষণা করে দিলো।

অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে সুজয় ষ্টেজে গিয়ে উঠল। সামনের সারিতে নজর পড়তে অনেক চেনামুখ ও দেখতে পেলো। তাদের মধ্যে মানসী ছিল মাঝখানে।

মানসী বিস্মিত হলো সুজয়কে দেখে। কারণ ও আশা করতে পারেনি, সুজয়কে আবার সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে দেখবে। আর তাছাড়া পিসিমার মুখে তো শোনেনি সুজয় আবার গান গাইতে পারে।

শেষ পর্য্যন্ত সকলকে অবাক করে দিয়ে, সুজয় শেষ রক্ষা করল। পর পর দু'খানি ভাল বাংলা গান গেয়ে জলসার মান ও রাখল।

বন্ধুরা অপ্রত্যাশিত সাফল্যে লাফিয়ে উঠল। হারু আনন্দে ছুটে এসে সুজয়কে জড়িয়ে ধরলো। ও ভাবতে পারেনি সুজয় এত ভাল গাইবে। তাই আনন্দের উত্তেজনায় বলল—তাহলে মানসী দেবীকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম।

*   *   *

দশমী চলে গেল। এবার ৺বিজয়ার পালা। তাই সকলেই গেল সুরেন বাবুর বাড়ীতে।

কথা আলাদা। তুমি ভাল ছেলেকে টাকার ওজন দিয়ে নিয়ে আসবে।

সুরেনবাবু অমায়িক হাসলেন।

তারিণীবাবু সুযোগ পেয়ে আবার কথা শুরু করলেন।

—এই দেখ্ না, আমার মেয়ের জন্য কি কম চেষ্টা করছি। একটা ভাল পাত্রের সন্ধান আজ পর্যন্ত পেলাম না। চারিদিকে হাঁটাহাটি আর দুশ্চিন্তায় আমি নিজেই এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

এইটুকু বলে তারিণীবাবু হাঁপানী রোগের জন্য বিষম কেসে উঠলেন। তারপর খানিকটা দম নিয়ে আবার বললেন—তা গিন্নী এই ক'মাস ধরে একটা প্রস্তাব তুলেছে। ঐ জলধরের ছেলের সাথে আমার পুঁটিরাণীর বিয়ের জন্য।

আমার কিন্তু প্রথমে একেবারেই মত ছিল না। সংসারে কি আছে বল ওর। কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, যে বিপদের সময় এসে পেছনে দাঁড়াবে। তারপর ভিটেমাটি পর্যন্ত তোমার কাছে বন্ধক রয়েছে।

অবশ্য পরে ভাবলাম নেহাৎ মন্দ হবে না। হাজার হোক আমাদের জলধরের ছেলে। এ সময়ে আমরা না দেখলে, কে দেখবে বল ওকে। আর বি. এ. পরীক্ষাটাও পাশ করেছে। যা আজকাল সবচেয়ে বেশী দরকার।

সুরেনবাবু প্রসন্নচিত্তে বললেন—এ তো খুব ভাল কথা। এটাই পাকা করে ফেলো না। ভিটেমাটির জন্য কি আছে। জলধর জীবিত-কালেই তো বলেছি। যখন সুবিধে হয় টাকাটা দিলে চলবে। এর জন্য তো আমার তেমন তাগাদা নেই।

তারিণীবাবু এবার বাকিটুকু বলার উৎসাহ পেলেন। ভাল করে কেসে নিয়ে বললেন—আরে সে কথাই তো বলছি। আমি তো জানি, তুমি কোনদিনই সেই টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না।

তাই একদিন গিন্নীকে তো পাঠালাম জলধরের স্ত্রীর কাছে। প্রস্তাব শুনে তিনি তো এক কথায় রাজী হলেন। কিন্তু সুজয় বসল বেকে।

ভাবলাম বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয়ই রাজী হবে। তাই একদিন আমিও গেলাম।

কিন্তু ওর কথা শুনে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল। বললে— দু'জনের মনের পূর্ণতা না থাকলে, সে বিয়ে কখনও সুখের হতে পারে না কাকাবাবু। আপনি অন্যত্র ব্যবস্থা করুন।

তুমি ভাবতে পারো এ-কথা। শেষ পর্যন্ত জলধরের ছেলে কিনা আমাকে এ-কথা বলল। একটু লজ্জা পর্যন্ত পেলো না।

তবুও ভাবলাম। এখন ওর কাঁচা বয়স। তাই অনেক কিছু কল্পনা করে বসে আছে। কিন্তু বাস্তব সংসারটা যে কি জিনিষ, তা এখনও যে ও টের পায়নি।

তাই বুঝিয়ে বললাম—কেন পুঁটি তো লেখাপড়া কিছু কম শেখেনি বাবা। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে। চিঠিপত্রও ভাল লিখতে পারে। আর এর চেয়ে কি বেশী দরকার আমাদের ঘরে। এতে তো তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয় বাবা। আর তাছাড়া তোমাদের যে টাকাটা ঋণ আছে, সেটা আমি শোধ করে দেবো। ওর জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

কিন্তু আমার সমস্ত কথাই অনর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত বললে— আমায় ক্ষমা করুন কাকাবাবু। পিতৃঋণ আমি নিজেই শোধ করবো। আর তাছাড়া আমি নিজেকে এখন বিয়ে করার উপযুক্ত বলে মনে করি না। আর কোনদিন বিয়ে করবো কিনা তাও একপ্রকার অনিশ্চিত। সুতরাং আপনি আর এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

তাই তোমাকে বলছি সুরেন, তুমি একটু টাকার জন্য চাপ দাও দেখি। দেখি বাছাধন কোন পথে যায়। জীবনটাকে বড় বেশী বুঝে ফেলেছে।

॥ ৪ ॥

তারিণীবাবু চলে যাবার পর সুরেনবাবু উঠতে পারলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন তারিণীবাবুর কূট-কৌশলটি। কেমন ফাঁদ ফেলে কাজটি সুন্দরভাবে গুটিয়ে নিতে চায়। অথচ কেউ বুঝতে পারবে না তার এই হীন ষড়যন্ত্র।

তারিণী চক্রবর্ত্তী বরাবরই এমন প্রকৃতির। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে তিনি যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ তার মনে নেই। তাই কেমন কথার ছলে সুরেনবাবুর নিকট নিজের মতলবটি খুলে বললেন।

কিন্তু এই প্রস্তাবে সুরেনবাবু আন্তরিক ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছেন। মুখে তিনি কিছু বলেননি সত্যি। কিন্তু মনে মনে তিনি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাছাড়া এই চক্রান্তে বা তিনি কি করে সায় দেন। কারণ এখনও স্বর্গত জলধর রায়ের স্মৃতি যে, তার মন থেকে মুছে যায়নি।

সেবার কি একটা প্রয়োজনে সুরেনবাবু দেশের বাড়ীতে এসেছিলেন। তারপর এক রাত্রিতে দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। দরজা খুলে সুরেনবাবু দেখলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন জলধরবাবু।

সুরেনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—কিরে এত রাত্রিতে ?

—একটা কথা আছে সুরেন, যদি কিছু মনে না কর। তাহলে বলি।

—আচ্ছা তুমি আমাকে এত পর ভাবো কেন বলতো ?

—পর নয় সুরেন। কথাটা যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক অক্ষমতার পরিচয়।

—তা হোক। তুমি বল।

—এতদিন মাষ্টারী কোরে তো তেমন পয়সার মুখ দেখলাম না।

তাই ভাবছি, ছোটখাটো একটা ব্যবসা করবো। কিন্তু ঘরে তো টাকা পয়সা একটিও নেই। ছেলেটার কলেজের পড়াটা পর্যন্ত ভাল করে চালাতে পারছি না। তাই ভাবছি তোমার কাছে বাড়ীটা বন্ধক রেখে, হাজার তিনেক টাকা ঋণ নেবো।

—বেশ তো ব্যবসা কর। এরজন্য বাড়ী বন্ধক দেবার কি আছে। যখন সুবিধে হয়, টাকাটা ফিরিয়ে দিও।

জলধর বাবুর চোখে তখন জল এসেছিল। গলার স্বর তখন অস্বাভাবিক কেপে উঠল। তবুও কোনরকম বললেন—বড় আঘাত পেয়ে আমাকে আজ এই কথা বলতে হলো সুরেন। কোনদিনই ভাবতে পারেনি মাস্টারী জীবন ছেড়ে আমাকে ব্যবসার জন্য ভাবতে হবে।

কিন্তু জীবনের এই দীর্ঘ পরিক্রমায়, আমি আজ কি পেয়েছি বলতো ? অবশ্য যাদের আমি মানুষ করে তুলেছি, তাদের দেখলে মন আমার আনন্দে ভরে উঠে।

কিন্তু এই তৃপ্তি যে আমার সব সময় থাকে না সুরেন। যখন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকি। তখন যে আমার অনেক কিছু দেবার থাকে। আর তা আমি কোনদিনই দিতে পারিনি সুরেন।

তাই আজ আমি এই পথ বেছে নিয়েছি। দেখি চেষ্টা করে, যদি নূতন করে বাঁচতে পারি।

পরদিন জলধরবাবু এসেছিলেন সুরেনবাবুর বাসায়। হাতে ছিল তার কাগজে মোড়া দলিল খানি। সুরেনবাবু প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন—এটা তুমি নিয়ে যাও জলধর। নইলে আমি খুব দুঃখ পাবো

—তা হয় না সুরেন। বিনা বন্ধকে টাকা নিলে, তাতে দায়িত্বটা অনেক কমে যায়। আর তাছাড়া আমি যখন নিজে বলছি। তাতে আর তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।

শেষ পর্যন্ত এক রকম জোর করেই বাড়ীর দলিলখানি রেখে, জলধরবাবু তিন হাজার টাকা ঋণ নিলেন।

তারপর তিনি শুরু করেছিলেন চালের ব্যবসা। দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। পাইকারী ব্যবসাদার হিসেবে জলধরবাবু দুটো পয়সার মুখ দেখলেন। তাই তিনি ভাড়া নিলেন একখানি গুদামঘর।

সেখানেই তিনি সমস্ত চাল মজুত করতে শুরু করেছিলেন। আর সেই গুদামঘর দেখবার জন্য রেখে দিলেন একজন বিশ্বাসী দারোয়ান।

দারোয়ানটির স্বভাব চরিত্র ভালই ছিল। কিন্তু দোষ ছিল শুধু নেশার। তাই মাঝে মাঝে দারু খেয়ে চুপ করে বসে থাকতো টুলের উপর।

জলধরবাবু প্রথমে টের পাননি। কেন অমন করে গুম্ মেরে বসে থাকে দারোয়ানটি। তাই একদিন যখন কাছে গিয়ে কথা বললেন, তখন নাকে তিনি বিশ্রী গন্ধ পেলেন।

সেদিনই জলধরবাবু স্থির করেছিলেন, লোকটিকে পালটে নেবেন। কারণ এমন নেশা খোর লোক দারোয়ানের কাজে নিরাপদ নয়। যে কোন দিন বিপদ ঘটতে পারে আকস্মিক ভাবে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঘটবার আগেই, জলধরবাবুর বিপদটি ঘটে গেল।

সেদিন শীতের রাত্রি। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধতায় মগ্ন। ঘন কুয়াশায় শালুকপুর তখন সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে। কোনদিকে দৃষ্টি দিলে চোখে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু হাড় কাঁপানো শীতের হিমেলস্পর্শ।

এমন সময় দারোয়ানটি ভাটি খানা থেকে দারু খেয়ে এলো। গায়ে জড়ানো তার একটি কম্বলের মত মোটা চাদর। শক্ত সমর্থ মানুষের মত দারোয়ানটি তখন দাঁড়াতে পারছিল না। কোন রকম টলতে টলতে এসে সে গুদাম ঘরের দরজাটি খুলল। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে ঘরের লম্ফটি জ্বালালো।

দারোয়ানটি তখন জ্বলন্ত লম্ফটি একটি চালের বস্তার খাঁজে রাখল। তারপর নেশার টানে ঢলে পড়ল বস্তা গুলোর উপর।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। বেশ ভাল করেই আগুন লাগল চালের বস্তার মধ্যে। নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ঘরের চারিদিকে। লেলিহান অগ্নিশিখা তখন দারোয়ানকেও স্পর্শ করেছে।

দারোয়ানটি তখন বার দুয়েক গুমরে উঠল। তারপর আর কোন চিৎকার শোনা গেল না। বাইরে তপ্ত আগুনের শিখায় সমস্ত গ্রাম তখন আলোময়।

চারিদিক থেকে সমস্ত লোক ছুটে এলো আগুন নেভাবার জন্য। কিন্তু তাদের সেই ক্ষুদ্র প্রয়াস, এই বৃহৎ ধ্বংসের কাছে ছিল খুব সামান্য। তাই একান্ত নিস্ফল প্রয়াসে, ভস্মীভূত হলো গুদাম ঘর খানি।

আগুন যখন নিভানো হলো, তখন খোঁজ করা হলো দারোয়ানের। কিন্তু তার কয়েকখানি অস্থি ছাড়া আর কিছুই খুজে পাওয়া গেল না সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে।

এই আকস্মিক আঘাতে জলধরবাবু বিছানা নিলেন। তারপর এক রাত্রিতে ভোর হবার আগেই তিনি বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে। পরে রইলো শুধু তার ছোট সংসার। স্ত্রী আর একমাত্র পুত্র সুজয়।

* * *

এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তখন সুরেনবাবু কলকাতায়। তিনি নায়েবের চিঠি থেকে সমস্ত খবরই জানতে পেরেছিলেন। তারপর আর কাজের চাপে তিনি দেশে আসতে পারেননি। তাই সেই থেকেই নায়েব মশাই সমস্ত কাজ দেখাশুনা করছেন। আর মাঝে মাঝে পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দেন সুজয়কে।

এমন সময় নায়েব এলেন ঘরে। এতদিন পুজোর জন্য অনেক দরকারী কথা বলতে পারেননি কর্তা বাবুর সাথে। তাই আজ সুযোগ পেয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন সুরেনবাবুর নিকট।

নায়েব মশাই খাতা পত্তর খুলে, গত দু'বছরের জমা খরচের হিসাব

দেখালেন। তারপর পাওনা টাকার ফর্দ দেখিয়ে বললেন—অন্যান্য দেনাদাররা প্রত্যেক বছর কিছু কিছু টাকা শোধ করেছে। কিন্তু স্বর্গত জলধরবাবুর তিন হাজার টাকার এক পয়সা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গত মাসে টাকার জন্য জলধরবাবুর ছেলেকে তাগাদা দিয়েছিলাম। বলেছে, এ বছর সমস্ত টাকাটা শোধ করে দেবে।

সুরেনবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন—ও টাকাটা হিসাবের খাতা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে রাখুন নায়েবে মশাই। আর ওকে তাগাদা দেবেন না। যদি নিজ থেকে কোন দিন টাকা দিতে আসে, তাহলে টাকা গুলো রাখবেন।

নায়েব মশাই কথাশুনে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন সুরেনবাবুর দিকে। কারণ এতগুলো টাকা অহেতুক ভাবে কেন তিনি ছেড়ে দিতে চাইছেন, তার কোন সঠিক কারণ নায়েব মশাই তৎক্ষণাৎ খুজে পেলেন না।

॥ ৫ ॥

দশমীর শেষে সুজয় বাড়ী ফিরেছিল সন্ধ্যায়। তারপর আর বাড়ীর বাইরে যায়নি। কেমন একটা লজ্জা আর অপমানের জ্বালা ওর মনকে নীচু করে দিয়েছিল।

সুজয় জানতো বন্ধুদের সাথে বেরলে, ওকে যেতে হবে মানসীদের বাসায়। আর সেখানে সুরেনবাবুকে ৺বিজয়ার প্রণাম দিতে হবে। আর তখনই হয়ত সুরেনবাবু চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করবে ওর নাম।

নাম শুনে ঋণের কথাও হয়ত তার মনে পরবে। আর একটা উপেক্ষা অথবা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে ওর দিকে। যেটা ও আজ পর্যন্ত কোন দিনই সহ্য করতে পারেনি।

ছেলেকে অমন চিন্তা ক্লিষ্ট দেখে মা বললেন—কিরে ৺বিজয়ার দিনে ঘরে বসে রইলি। সকলকে প্রণাম করে আয়।

সুজয় মাকে প্রণাম করে বলল—তিনিজেকে ভয়ানক ছোট মনে হচ্ছে মা। বিস্ময়ে তিনি বললেন—সে কি কথারে?

সুজয় চুপ করে রইলো। মুখটা সত্যি ওর খুব ম্লান দেখাল।

তিনি অনুমানে কারণটি বুঝলেন।

শেষে বললেন—এতে ছোট ভাববার কি আছে। প্রয়োজনে ঋণ নেওয়া হয়েছে, তিনি শোধ করতে পারেননি, তুই সময় নিয়ে শোধ করে দিবি। এতে তো লজ্জার কিছু নেই।

তবু ও সুজয় চুপ করে রইলো। মার কথাগুলো সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ হলেও, ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল ও মোটেই এই কথায় স্বাভাবিক হতে পারেনি।

তাই সুজয়ের মা শঙ্কিত হয়ে বললেন—কেন, ওরা টাকার জন্য আবার কিছু বলেছে?

—না।

—তবে যা সুরেন বাবুর সাথে দেখা করে আয়। আর উনি বা কি ভাববেন। এর মধ্যে তোর একবার দেখা করে আসা উচিত ছিল।

দিন কয়েক পর সুজয় একদিন সুরেন বাবুর বাসায় গেল। উপরে ও যত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভিতরে লজ্জায় তত বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো।

দরজায় পিসিমার সাথে সুজয়ের প্রথম দেখা হলো। তাকে প্রণাম করে সুজয় বলল—৺বিজয়ার নমস্কার দিতে এসেছি পিসিমা। কাকাবাবু কোথায়?

পিসিমা সস্নেহে বললেন—এতদিন পরে এলে বাবা। শরীর বুঝি অসুস্থ ছিল।

সুজয় এবার লজ্জা পেলো মিথ্যে বলতে। কারণ ও জানে পিসিমা ওকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। তাই তো এমন স্নেহপুর্ণ

প্রশ্ন করেছেন। সুতরাং তার কাছে মিথ্যে বলতে, সুজয় যেন নিজের কাছে ভয়ানক লজ্জা পেলো।

তাই সুজয় বলল—না পিসিমা, শরীর ঠিক খারাপ হয়নি। ৺বিজয়ার দিনই আসতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর আসতে পারেনি।

—ঘরে গিয়ে বস বাবা। আমি এখুনি তোমার কাকাবাবুকে খবর পাঠাচ্ছি।

সুজয় আজ দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে দত্তবাড়ী ঢুকল। এর আগে একবার এসেছিল ওর বাবা জীবিত থাকতে। তখন ও অপরিণত মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল সব ঘরে। তারপর আর আসেনি।

কতদিন পিসিমা স্নেহ কোরে বলেছেন—সুজয় গ্রামের ছেলেরা কত খুশী হয়ে, আমার ঘরে এসে কথা বলে যায়। আর তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বল। কেন এমন কর বলতো ?

সুজয় তখন চুপ করেছিল। কি জবাব দেবে পিসিমাকে। ওর প্রখর আত্মসচেতন মনটি যে তখন কোমল হতে পারেনি। মনের কোথায় যেন একটু স্বাভাবিক হবার বাধা থেকে গেছে। তাই ও কতদিন নিজেকে আড়াল করছে, পিসিমার কাছ থেকে।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তখনও কেউ আসেনি উপর থেকে। সুজয় ভাল করে চেয়ে দেখল ঘরের চারিদিক।

মোজাক করা মেঝে। দেওয়ালে বৃহৎ নৈসর্গিক তৈল চিত্র। পূর্ব-পুরুষদের আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি। উপরে ঝোলান বেলয়ারীর আলোর ঝাড়। মেহগিনি কাঠের গদিযুক্ত কেদারা। আর তার পাশে টেবিলের উপর রয়েছে, রুপোর রেকাবীতে সদ্য তোলা কতগুলি বেলফুল।

ধীর পদক্ষেপে সুরেনবাবু ঘরে ঢুকলেন। পড়নে তার শুভ্র বসন। গায়ে জড়ানো একটি কাশ্মীরি আলোয়ান। এই প্রথম তিনি সুজয়কে যুবক অবস্থায় দেখলেন।

সুজয় এগিয়ে এসে বলল—আমি স্বর্গত জলধর রায়ের ছেলে সুজয়। আমার ৺ বিজয়ার প্রণাম নিন।

সুরেনবাবু স্নেহ করে বললেন—অনেক বড় হয়ে গেছ! কতছোট তোমাকে দেখেছিলাম।

সুজয় মৃদু হাসলো।

—এখন কি করছো?

—এবার বি. এ. পাশ করেছি। ইচ্ছে আছে এম. এ. পড়ার।

সুরেনবাবুর ইচ্ছে হলো ওকে একটা পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সুজয় কি স্ব-ইচ্ছায় সেই সুযোগ নিতে চাইবে।

ও যে ঠিক ওর বাবার মতই হয়েছে। কারো সহযোগিতা ওর কাছে করুণা বলে মনে হয়। অথবা এই সহযোগিতা গ্রহণ করলে যেন ওর দীনতা প্রকাশ পাবে।

সুরেনবাবু বললেন—এখানে থেকে পড়ার অসুবিধা হলে, আমার কলকাতার বাসায় যেতে সঙ্কোচ কোরো না। সেখান থেকে তোমার সব রকম পড়ার সুবিধে হবে

কথাটি যেন সুজয়ের মনে কাঁটার মত বিধল। কারণ ওর অক্ষমতার সম্ভাবনা যেন চাবুক মারলো স্বাবলম্বী মনকে। তাই সুজয় সহ্য করতে পারল না, এমন অযাচিত সুযোগের ব্যবস্থা। বরং পুর্ব্বের ঋণের কথা ভেবে, সুজয় আরো তীব্র অপমান বোধ করল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সুজয় বলল—না, তেমন কোন অসুবিধা হবে না কাকাবাবু।

এমন সময় মানসী পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। আজই ও পিসিমার কাছ থেকে সুজয়দের ঋণের কথাটি শুনেছে। এতদিন এই ঋণের ব্যাপার ও আদৌ জানতো না। তাই কতকটা কৌতুহল নিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল পর্দার আড়ালে।

পিসিমা সেটা লক্ষ্য করে বললেন—কি দেখছিসরে অমন কোরে?

মুখে আঙ্গুল দিয়ে মানসী দুষ্টুমী কোরে বলল—চুপ!

তারপর সুজয় সামান্য মিষ্টিমুখ কোরে উঠল। পিসিমা স্নেহভরে বললেন—এত কাছাকাছি থাকো; আবার এসো বাবা।

এমন সময় মানসী এসে ঘরে ঢুকল। সুজয় তখন ঘরের বাইরে চলে গেছে।

সুরেনবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন—ঠিক বাপের মত হয়েছে। একেবারে আশ্চর্য মিল।

মানসী কথাটি বুঝে কোন প্রশ্ন করল না। চুপ কোরে একখানা মাসিক পত্রিকা খুলে ধরল।

কিন্তু পিসিমা বললেন—যাই বল সুরেন। গ্রামের যত ছেলেকে আমি দেখলাম। ওর মত একটি ছেলেও আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। ওর কথা আর ব্যবহারে আমার যেন কেমন মায়া হয়।

মানসী মৃদু হেসে বলল—তোমার ত সবাইকে দেখলেই এমন হয় পিসিমা।

—না রে, তা নয় সত্যি ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়। মনে হয় ও যেন আমার অনেক কালের চেনা। বোধহয় আগের জন্মে আমার কেউ ছিল।

মানসী উপরে যত লঘু কোরে কথাগুলো শুনলো কিন্তু মনে মনে কথাগুলোকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারল না। বরং ওর মনের মণি-কোঠায় কে যেন মৃদু এক ঢেউ তুলে দিলো। আর এই মৃদু তরঙ্গের মাঝখানে যে মুখটি স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠল, তার দুর্নিবার আকর্ষণে মানসী যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

পিসিমা মানসীর মনের অবস্থাটা লক্ষ্য করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানসীর মনের কথা। আর তিনিও চান এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি কোরে, তিনি এ বিষয়ে মানসীর সাথে কথা বলতে পারেননি। কারণ মানসী কলকাতায় বড় হয়েছে। আর ওর মন আর রুচি সম্পূর্ণ শহর ঘেষা। তাই মানসী গ্রামের ছেলে বলে, সুজয়কে খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাখান করতে পারে।

আর তাছাড়া এদিকে সুরেনবাবুরও একটা মতের দরকার।

একমাত্র মেয়েকে তিনি যে বিলাত ফেরৎ ডাক্তার অথবা বড় ইঞ্জিনীয়ারের সাথে বিয়ে দেবেন, সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। তাই এ সমস্ত কথা চিন্তা কোরে পিসিমা শেষ পর্যন্ত মনের ইচ্ছাকে আর প্রকাশ করেননি।

*   *   *

একদিন বিকেলে মানসী বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। সঙ্গে সুরেন বাবুরও যাবার কথা কথা ছিল। কিন্তু দাবা খেলার জন্য জনকয়েক প্রৌঢ় আসতে তার আর যাওয়া হলো না।

তাই মানসী বেড়াতে না গিয়ে বাড়ীর পেছনের বাগানের ফুল গাছ গুলি দেখতে গেল। তাদের মধ্যে রজনী গন্ধা আর গোলাপের গাছগুলি ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয়। তাই ও নিজের হাতেই গাছ গুলিতে জল দেয়।

কিন্তু বাগানে ঢুকে মানসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্বচক্ষে দেখতে পেলো গ্রামের একটি বছর আটেকের ছেলে প্রাচীর টপকে বাগানের ফুলগুলি তুলছে।

ক্রোধে মানসীর মুখটা লাল হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপনে দারোয়ান রামহরিকে ডাক দিলো।

দারোয়ান রামহরি কোমরে মোটা বেল্টটাকে বেশ শক্ত করে এটে, গুটি গুটি কোরে এগিয়ে গেল ছেলেটিকে ধরতে।

কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ফুল তুলছিল। আর এমনিতেও বেশ চালাক। তাই দারোয়ানকে দেখতে পেয়েই ছেলেটি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু দারোয়ানটি তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। এখন সোজা ছুটে প্রাচীর টপকাতে গেলে নিশ্চিত ও ধরা পড়ে যাবে। তাই ছেলেটি প্রাচীরের দিকে না ছুটে, চড়কি বাজীর মত ছুটতে থাকে বাগানের ভেতর। আর মেদবহুল দারোয়ানও গলদঘর্ম হয়ে ছুটতে লাগলো ছেলেটির পেছন পেছন।

অবশেষে ছেলেটি প্রাচীর টপকে যাবার মুহূর্তে, দারোয়ানটি একটি ঢিল ছুড়ে মারল ছেলেটির পা লক্ষ্য কোরে। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বেশ জোরেই লাগলো ঢিলখানা। ছেলেটি একটি গুমরানো শব্দ কোরে, লাফিয়ে পড়লো প্রাচীরের ওপাশে।

দারোয়ান তৎক্ষণাৎ বার কয়েক প্রাচীর টপকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অঙ্গ আর না পেরে, বাগানের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ছেলেটি তখন আর দৌড়াতে পারেনি। কোন রকম খুড়িয়ে খুড়িয়ে কিছুটা পথ মাত্র এগিয়েছে। আর এমনি সময় সুজয় আসছিল ঐ পথ দিয়ে। তনুর চোখে জল আর পায়ে রক্ত দেখে, সুজয় বিস্ময়ে এগিয়ে গেল তনুর দিকে।

ইতিমধ্যে দারোয়ানটি তনুর মন্থর গতি দেখে দ্রুত ছুটে এলো ধরতে।

তনু এবার ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সুজয়কে জড়িয়ে ধরল।

দারোয়ান চিৎকার দিয়ে বলল—উসকো আপ ছোড় দিজিয়ে। এক নম্বর ডাকু হ্যায়।

সুজয় বা হাতে তনুকে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কি করেছিলি?

তনু কোন উত্তর দিল না। পায়ের ব্যথা, ভয় আর লজ্জায় ওর মুখ তখন প্রায় রক্ত শূন্য হয়ে গেছে।

দারোয়ানটি পুনরায় সদম্ভে বলল—এ ডাকু ফুল চুরি কিয়া। উসকো হাম পা কাট দিয়া। হাত ভি হ্যাম তোড় দেগা।

সুজয় এবার তনুর ক্ষত স্থানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল—তাই বলে এমন কোরে মারবে দারোয়ানজি।

ইতিমধ্যে মানসীও বাগানের দরজা দিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। দিদিমুনিকে দেখে দারোয়ানটি পুনরায় গর্জন কোরে উঠল—উসকো আপ ছোর দিজিয়ে। এক নম্বর বদমাস।

সুজয় এবার কঠিন হয়ে দারোয়ানকে বলল—আর এক পাও এগোবে না দারোয়ানজি। তাহলে তোমারও হাত-পা ভেঙ্গে যাবে।

অমন দৃঢ় কথা আর শানিত দৃষ্টি দেখে দারোয়ানটির গর্জন এবার থেমে গেলো। তাই কাচুমাচু কোরে দারোয়ান তাকালো দিদিমুনির দিকে।

মনিবের সম্মুখে দারোয়ানের এমন অবস্থা দেখে মানসী সহ্য করতে পারছিল না এই দৃশ্যটা। তাই তির্যক দৃষ্টিতে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ওকে যেমন বাঁচালেন। আমার বাগানের ফুলগাছ গুলিও তেমনি বাঁচিয়ে দিয়ে যান।

কথাটিতে যে তীব্র শ্লেষ আর বিদ্রূপ মাখানো ছিল, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সুজয়ও যেন প্রস্তুত ছিল অমন কথা শুনবার জন্য।

তাই সুজয় বলল—আপনার বাগানের গাছগুলি যদি মানুষের মত রক্ত মাংসে গড়া হতো, তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম মানসী দেবী।

এমন মোক্ষম জবাব পাবে মানসী তা ভাবতে পারেনি। তাই শুধু অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মানসী সুজয়ের দিকে

কিন্তু সুজয় আবার বলল—আর এমনকি অমার্জনীয় কাজ করেছে ও। ছিঁড়েছে তো সামান্য কয়েকটি ফুল। তাও আবার আট বছরে ছেলে। যে কাজটা শুধু ওদের শিশু সুলভ মনের জন্যই সাজে।

কিন্তু তারও তো একটা শোধরাবার সহজ পথ আছে মানসী দেবী। চেয়ে দেখুন দেখি, কি অমানুষিক ব্যবহারের স্বাক্ষর আপনি রেখেছেন ছেলেটির পায়ে।

মানসী এবার তনুর ক্ষত স্থানের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ক্ষতস্থান দিয়ে তখন বেশ রক্ত গড়িয়ে পরছিল।

মানসী আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। ফুল চুরি করার চেয়েও এ ঘটনাটা যেন আরো অঘটন মনে হলো। তাই লজ্জায় আর অপমানে এবার ওর কটাক্ষ দৃষ্টিটা যেন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

কিন্তু সুজয় আর দাঁড়ায়নি সেখানে। পকেটের রুমাল দিয়ে ক্ষত স্থানটি বেধে, তনুকে নিয়ে চলে গেল বাড়ীর দিকে।

মানসী সুজয়ের এই তৎপরতা লক্ষ্য করল। তারপর চেয়ে রইলো ওদের চলার দিকে। একটা রাস্তার বাঁকে ওরা মিলিয়ে যাবার পর, মানসী ফিরে তাকালো রামহরির দিকে।

পশ্চিমা রামহরি এতক্ষণ দর্শক হিসাবেই সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। ও যে প্রত্যক্ষ ভাবে এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তা যেন একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তাই মানসীর দৃষ্টি যখন ওর দিকে নিবদ্ধ হোল, তখন ওর মনটি সচেতন হয়ে উঠল।

মানসী রুক্ষস্বরে রামহরিকে বলল—বেকুব কোথাকার! সামান্য বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত ঘটে নেই। এভাবে মারতে তোকে কে বলেছে?

দারোয়ানটি আর কোন কথা বলল না। শুধু অপরাধীর মত চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

কিন্তু ঘরে ফিরে মানসী স্থির হোতে পারল না। একটা চাপা উত্তেজনায় বারবার সুজয়ের কথা মনে হোতে লাগলো। আর একটা বিষম ক্রোধ ওর মনে যেন পাক খেতে লাগলো।

কারণ প্রত্যেক বারই সুজয় ওকে উপেক্ষা অথবা অপমান কোরে কথা বলেছে। যা আজ পর্যন্ত আর কোন ছেলেই অমন ব্যবহার করতে সাহস করেনি। বরং তারা মানসীকে কাছে পেলে, কিসে তাকে তুষ্ট করবে, সেদিকে তাদের সদা ব্যস্ততা।

আর তাছাড়া আজকের ব্যাপারটা নিয়ে, সুজয় যে ভাবে ওকে কথা বলেছে, তা যে কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। কি ভাবে এই অঘটনটা ঘটলো, তা একবার ওর ভাবা উচিত ছিল। তাই একথা ভেবে মানসীর অপমানের জ্বালাটা যেন আরো তীব্র বোধ হলো।

॥ ৬ ॥

সকালে খাদু নিজের ঘরে বসে হারুকে নিয়ে গল্প করছিল। আর ভ্যাবলা হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে যেন ছুটে এঁলো।

প্রথমে খাদুকে দেখতে পেয়ে ভ্যাবলা পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলল —খাদু তুই না বলেছিলি আমি কোনদিনই কবি হতে পারব না। কিন্তু আজকে তোকে এমন প্রমাণ দেখাবো, যাতে আর তুই কোনদিনই সে কথা বলবি না।

হারু অমন কথা শুনে অবাক হলো। তাই বলল—কাগজে তোর কবিতা বেড়িয়েছে বুঝি ?

ভ্যাবলা ঈষৎ হাসি মুখে বলল—বের হয়নি। তবে এবার বেরোবে।

খাদু বলল—কি প্রমাণ দেখাবি বললি ?

—দেখাবো একটু ধৈর্য্য ধর।

ভ্যাবলা পকেট থেকে একখানা ভাজ করা কাগজ বার করে, বুকে ছুইয়ে বলল—খুব মন দিয়ে শোন। কাল রাত্রিতে খুব মুডে লিখেছি।

ওগো মানসী,
তুমি যে আমার ফাঁসী।
এসো মোর কাছে,
নিয়ে চলো দূর দেশে।
আমার পা যে খোঁড়া,
তোমার চোখ যে কানা,—
কেমনে চলিব মোরা
তাই শুধু হবে ভাবা।

কবিতাটি আবৃত্তি কোরে ভ্যাবলা ভাবে চোখ বুজে রইলো। আর খাদু অত্যন্ত অবাক হলো কবিতাটি শুনে। তারপর বিস্ময়ে বলল—

ছন্দের কি সুন্দর মিল হয়েছেরে ভ্যাবলা! মাইরি বলছি, এই কবিতা তোর নিশ্চয়ই ছাপা হবে।

ভ্যাবলা এবার চোখ মেলে, বুকে হাত দিয়ে জোর একটা নিঃশ্বাস নিলো। যেন খাদুর এই সুখ্যাতি শোনবার ওর কোন আগ্রহ নেই। এখন যার জন্য কবিতাটি লেখা হয়েছে, সে যাতে শুনে খুশী হয়, তবেই ওর এই কবিতা লেখা সার্থক হবে।

হারু এতক্ষণ চুপ করেছিল। কোন রকম হাসি চেপে বলল—আচ্ছা খাদু এই কবিতাটির অর্থ আমাকে বুঝিয়ে বলতো ?

—কেন এতো খুব সহজ অর্থ। এতে নূতন কোরে তো কিছু বলার নেই।

—তবুও বল না।

খাদু বলল—আচ্ছা ভ্যাবলা তোর কবিতা তুই বল।

ভ্যাবলা কাগজটা সামনে ধরে দৃঢ় চিত্তে বলল—হে মানসী। তুমি যে আমার জীবনের ফাঁসী। তুমি আমার কাছে এসো। আর আমাকে নিয়ে চলো দূর দেশে। কিন্তু ওগো আমার পা যে খোঁড়া। আর তোমার চোখ যে কানা। তাই আমরা কেমন করে যাবো দূর দেশে।

হারু গম্ভীর ভাবে বলল—তোর পা খোঁড়া হয়ে গেছে ?

—না।

—ঠিক করে দেখ হতভাগা!

ভ্যাবলা এবার হতভম্ব হয়ে পায়ে হাত দিয়ে বলল—না, পা ঠিক আছে তো ?

—মানসী দেবীর চোখ কানা ?

—না।

—তাহলে এ সমস্ত ছাই ভস্ম কি লিখেছিস হতভাগা! আর এ যদি মানসী দেবী একবার জানতে পারে। তাহলে ঠিক তোকে রাঁচির পাগলা গারদে পাঠাবে।

ভ্যাবলা এবার অপরাধীর মত চুপ করে রইলো। কিন্তু খাদু গম্ভীর

ভাবে প্রতিবাদ কোরে বলল—নারে হারু কবিতাতে এমন ভাব চলে। আমি শুনেছি কবিতা হচ্ছে কল্পনার রঙ্। সেখানে কবি ছন্দ মেলাবার জন্য যা খুশী তাই লিখতে পারে।

ভ্যাবলার মুখে এবার কথা ফুটল।—তুই ঠিক বলেছিস খাদু। কবি হচ্ছে কবিতার সৃষ্টি কর্ত্তা। সে ছন্দ মেলাবার জন্য যা খুশী তাই লিখবে। নইলে প্রেয়সীকে যে আপন করে সাজানো যায় না হারু।

ভ্যাবলার কথা বলার ভঙ্গী দেখে হারু আর বিশেষ কিছু বলল না। কারণ ও জানে ভ্যাবলার এই বিশেষ অবস্থায় কোন প্রশ্ন করলে, তার উত্তর ও ক্রমাগত দিয়ে যাবে। তা ভুল হোক, আর শুদ্ধ হোক। সেদিকে ওর কোন খেয়াল থাকবে না।

তাই হারু এবার অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল—তাহলে পুঁটিকে নিয়ে এবার থেকে কবিতা লিখবি না ?

ভ্যাবলা তাচ্ছিল্য কোরে বলল—দূর ওর মধ্যে কোন অনুভূতি নেই! আর তাছাড়া এবার থেকে আমাদের সম্পর্কটা মুছে ফেলবো।

খাদু বিস্ময়ে বলল—সে কি কথারে! তাহলে এতদিন পুঁটিকে নিয়ে ছেলে খেলার অর্থ কি ?

—ছেলে খেলা নয় রে খাদু। এটা হচ্ছে কবিদের একটা মস্তবর খেয়াল। আর এই খেয়ালের জন্যই তো আমরা কবিতা লেখার প্রেরণা পাই।

খাদু এই কথা শুনে খেই হারিয়ে ফেললো। এ কথার পরবর্ত্তী প্রশ্ন কি হোতে পারে, তা ওর মনে এলো না।

কিন্তু হারু প্রশ্ন করলো। তাহলে তুই বলতে চাস মানসী দেবীর সাথে একটা কিছু হবার পর, আবার তুই প্রেরণা পাওয়ার জন্য অন্য কোথাও ছুটবি ?

ভ্যাবলার মুখ এবার খুব করুণ দেখালো। বলল—নারে। তা আর কোনদিনই হবে না। যেদিন সত্যি-সত্যি মানসী দেবীকে পাবো, সেদিনই আমার কবিতা লেখা শেষ হবে।

ইতিমধ্যে খান্নু জানালার দিকে তাকিয়ে বলল---এই ভ্যাবলা ঐ দেখ পুঁটি এদিকে আসছে।

ভ্যাবলা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু পরমুহূর্তে পুঁটিকে দেখে, ভ্যাবলা বিদ্যুৎগতিতে কাগজটা পকেটে পুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর পুঁটিকে ডেকে বলল—দেখ পুঁটু তোমার সাথে একটা কথা আছে।

পুঁটি তার স্বভাব চিত্তে কর্কশ গলায় বলল—রোজ রোজ তোমার এই কাঁদুনে আমার ভাল লাগে না!

—না পুঁটু আমি হেঁয়ালি করছি না। আজ থেকে আমাদের সমস্ত সম্পর্কটা ভুলে যাও

পুটি এবার একটা মৃদু ধাক্কা খেয়ে সচেতন হয়ে উঠল। তাই অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে বলল—কি বললে? আবার বল দেখি?

পুঁটির এমন স্পষ্ট কথায় ভ্যাবলার গলার স্বর এবার জড়িয়ে এলো। তবুও ভ্যাবলা শক্ত হয়ে বলল—না পুঁটু, আমি এতদিন ভুল করে এসেছি। একজন কবির প্রেয়সী হবার যোগ্যতা তোমার নেই। আর সেই যোগ্যতা ছাড়া তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তাহলে আমার কবি প্রতিভার মৃত্যু হবে।

কথাটি সত্যি পুঁটির মনে সজোরে আঘাত দিল। কিন্তু পুঁটি শক্ত হয়ে বলল—রাখো তোমার প্রতিভা। এতদিন যে কত সং করে বলেছ---আমি তোমার কবিতার উৎস। আমার মুখের হাসি না দেখলে, এক কলমও তুমি লিখতে পার না। আর আজকে তুমি আমাকে একথা বলছ। বুঝেছি কার দিকে তোমার চোখ পরেছে।

— সত্যি পুটু আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। এতদিন যা হয়েছে, সব মিথ্যে। সব ভুল।

—থামো তুমি। আবার আদর করে পুটু বলা। কি অধিকারে তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো।

এমন কড়া সুরে ধমক খেয়ে ভ্যাবলা এবার চমকে উঠল। আর

কোন কথা বেরলো না ওর মুখ থেকে। এখন কোন রকম পুঁটির কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে যেন ও বাঁচে।

এমনি সময় তারিণীবাবুকে দেখা গেল গরম জামা কাপড় পরিহিত অবস্থায়। এতক্ষণ তিনি মেয়ের খোঁজ করছিলেন। মেয়ের বিয়ের কথার পর থেকেই, তিনি মেয়েকে খুব নজরে রেখেছেন। কোথাও এক মিনিটের জন্য তিনি মেয়েকে চোখের আড়াল করেন না। তাই সর্ব্বদা তার সতর্ক দৃষ্টি।

দূর থেকে মেয়েকে কথা বলতে দেখে তারিণীবাবু খুব দ্রুত হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এলেন। আর ভ্যাবলাও তার রোষদীপ্ত মূর্ত্তি দেখে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিল অন্য পথে।

হারু আর খাদু এতক্ষণ জানালার পাশে লুকিয়ে ওদের দুজনার কথা শুনছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তারিণীবাবুর মারমুখী আবির্ভাবে ওরাও ভয় পেয়ে জানালাটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলো।

তারিণীবাবু মেয়েকে বললেন—তুই আবার ঐ ফাজিল ছেলেটার সাথে কথা বলছিলি ?

—আমি কি কথা বলার জন্য এসেছিলাম। ঐ তো আমাকে ডেকে যা নয়, তাই শুনিয়ে দিলো।

তারিণীবাবু ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করে বললেন—কি এত বড় আস্পর্ধা। রাস্তায় ডেকে বাড়ীর মেয়েকে অপমান করা। দাঁড়া তাহলে।

পরমুহূর্তে তারিণীবাবু মেয়েকে ছেড়ে অগ্রসর হলেন, ভ্যাবলার পলায়ন পথে।

*　　　　*　　　　*

ভ্যাবলা অনেকটা পথ দৌড়ে একটি রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। কোনদিন ছোট বেলায় এমন দৌড় দেয়নি। আর এই দৌড়ের মধ্যে ছিল এক আতঙ্কের ভাব। তাই এই পরিশ্রমের চেয়ে, ভয়ের মাত্রা বেশী থাকাতে ওর খুব ক্লান্ত বোধ হলো।

কাপড়ের কোচাটা ওর খুলে গিয়েছিল। সেটিকে ভাল করে গুটিয়ে, বেশ কোরে গুঁজে নিল কোমড়ে। তারপর নজর পড়ল পায়ের দিকে। একপাটি চটি যে কখন ছিটকে পরেছে তাও মোটেই টের পায়নি।

তাই এক পাটি হাতে নিয়ে, ভ্যাবলা আবার পেছনের দিকে ফিরে গেল চটিটাকে খুঁজবার জন্য। কারণ ভ্যাবলা ভাবলো, তারিণীবাবু বোধ হয় এতদূর আর আসবেন না। বুড়ো মানুষ সামান্য ছুটে বোধ হয় হাঁপিয়ে গেছেন মাঝ পথে। তাই নির্ভয়ে ভ্যাবলা এগিয়ে গেল পেছনের দিকে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ভ্যাবলা সহসা তারিণীবাবুর মুখোমুখি হলেন। তারিণীবাবুর ভৈরবমূর্ত্তি দেখে ভ্যাবলা তৎক্ষণাৎ চটি ফেলে দৌড়দিলো ভুল পথে।

এবার আর তারিণীবাবু সহজে ছারলেন না। দৌড় দেখে মনে হলো যেমন করেই হোক তিনি ভ্যাবলাকে ধরবেন।

ভ্যাবলা যে পথে ছুটছিল। সে পথটি ছিল পুঁটিদের বাড়ীর দিক। কিন্তু ভ্যাবলার সেদিকে প্রথম খেয়াল ছিল না। যখন ও বুঝতে পারল তখন আর গতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হলো না।

এখন একমাত্র পথ, পুঁটিদের বাড়ীর উঠোনের উপর দিয়ে যেতে হবে। আর তা না যেতে পারলে একেবারে নিশ্চিত ধরা পড়বে তারিণী বাবুর হাতে।

আর সে পথও খুব সহজ নয়। বাড়ীর ভিতর ঢুকলেই অমনি তারিণীবাবুর সেই বুড়ো পোষা কুকুরটা দাঁত বার কোরে এগিয়ে আসবে। আর তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলে নির্ঘাত দাঁত বসিয়ে দেবে পায়ে।

এই কথা ভেবে ভ্যাবলার দৌড়টা অনেক মন্থর হয়ে এলো। ইতিমধ্যে পুঁটির মার সাথে ভ্যাবলার পথে দেখা হলো। ভ্যাবলাকে অমন কোরে ছুটতে দেখে, তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ও ভ্যাবলা অমন কোরে ছুটছো কেন? কি হয়েছে?

ভ্যাবলার ধড়ে যেন প্রাণ এলো। কোন রকম হাঁপাতে বলল—মাসিমা বিপদ হয়েছে। আমাকে বাঁচান

তিনি কপালে চোখ তুলে বললেন—কি বিপদ হয়েছে ?

—দেখুন না মেসো মশাই কি রকম তাড়া করছে।

পুঁটির মা কথাটির বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারলেন না। তাই আবার প্রশ্ন করলেন—মেসো মশাই তাড়া করছে, কিসের জন্য ?

—ব্যাপারটা সামান্যই ছিল মাসিমা। কিন্তু মেসো মশাই যে রকম গুরুতর করে নিলেন, এখন আমি পালাবার পথ পাচ্ছি না।

দোহাই মাসিমা আপনাদের কুকুরটা একবার ধরুন। আমি উঠোনটা পার হয়ে যাই।

মাসিমা বললেন—কুকুরটা শেকল দিয়ে বাঁধা আছে। তুমি যাও। তোমার কোন ভয় নেই !

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাবলা কৃতজ্ঞচিত্তে আর দেরী না কোরে দৌড় দিল উঠোনের উপর দিয়ে।

তারিণীবাবু যখন উপস্থিত হলেন। তখন পুঁটির মা দরজায় দাঁড়িয়ে। তারিণীবাবু কোন রকম দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঐ শয়তানটাকে দেখেছ ?

—শয়তান কি গো! ভদ্রলোকের ছেলেকে অমন কোরে গাল দিচ্ছ কেন ?

—গাল দেবো না। পুঁটিকে রাস্তায় ডেকে যা নয় ; তাই বলে অপমান করা। ওকে আবার ভাল বলবো। আজই ওর বাপকে ডেকে আমি সব কথা বলে আসবো। সব সময় মেয়েদের পেছনে ইয়ে করা।

—তুমি কি ক্ষেপেছ না কি ? কি বলেছে তা না জেনে শুনেই ওর পেছনে পেছনে ছুটছো। আর তাছাড়া ওকি পালিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বাড়ী গিয়ে তো ব্যাপারটা মিটিয়ে আসা যায়। এমনি ভাবে ছুটতে দেখলে, লোকেই বা কি বলবে।

—দেখ লোকে কি বলবে না বলবে সেদিকে আমার দেখবার দরকার নেই। আমি চাই এই মুহূর্তে এর বিহিত করতে।

—আচ্ছা তুমি কি পাগল হোলে! এই নিয়ে কি একটা কেলেঙ্কারী না বাঁধিয়ে ছাড়বে না?

—দেখ পুঁটির মা আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমার মুখের উপর তুমি কোন কথা বলবে না।

পুঁটির মাও স্পষ্ট বললেন—এমন কথা আমি বলতে চাইনি। তুমি বরং এই সন্ধ্যে বেলায় গলা চড়িয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছো।

—কি বললে, আমি ঝগড়া করছি?

—তুমি নয়তো কে? এখানে তো আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

—তারিণীবাবু নির্বাক হলেন অমন কথা শুনে। যার সাথে এতদিন ঘর কোরে এসেছেন, তাকে যেন আজ নূতন বলে মনে হলো। কারণ এর আগে আর কোনদিনই তিনি এমন কথা শোনেননি পুঁটির মার কাছ থেকে। আর আজ অকস্মাৎ এমন অপমানজনক কথা শুনে, তিনি যেন অনেকটা নিস্প্রভ হয়ে পরলেন।

পুঁটির মা লক্ষ্য করলেন তারিণীবাবুর মুখের ভাব। তাই কিছুটা অনুতপ্ত হয়ে বললেন—তুমি যে ভ্যাবলার সাথে অমন দাপট দেখাচ্ছ। এটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে। সুজয় যদি শেষ পর্যন্ত রাজী না হয়। তাহলে ঐ ভ্যাবলার হাতেই পুঁটিকে তুলে দিতে হবে। আর ভ্যাবলা ছাড়া তেমন অর্থবান সুপাত্র আমাদের গ্রামে নেই।

তারিণীবাবু আর কোন জবাব দিলেন না। আর জবাব দেবার মত তার মনের অবস্থাও ঠিক ছিল না। তাই ক্লান্ত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন নিজের ঘরের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন একটি কেদারার মধ্যে।

॥ ৭ ॥

রাত্রিতে খেতে বসে সুজয় মাকে বলল—দেখ আমি ভাবছি, কলকাতায় গিয়ে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করবো। এখানে শুধু মাষ্টারী কোরে, তেমন টাকা পয়সা রোজগার করা যাবে না। আর ঐ টাকায় ঋণও কোনদিন শোধ করা যাবে না। যদি সেখানে গিয়ে একটা ভাল সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে সব কিছু ব্যবস্থা হবে।

এ কথায় সুজয়ের মা আপত্তি করেনি। তিনি ছেলের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন তুই বড় হয়েছিস। যা ভাল বুঝিস, তাই কর।

শেষ পর্যন্ত সুজয় স্থির করলো এক মাসের জন্য কলকাতায় যাবে। যদি সেখানে গিয়ে একটা কোন রকম ব্যবস্থা করে নিতে পারে। তারপর সেই সূত্র ধরে হয়তো আরো ভালো সুযোগ আসতে পারে। যেগুলি হয়তো গ্রামে থাকলে আর কোন দিনই আসবে না।

তাই সুজয় কলকাতা যাবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে রাখলো। কিন্তু গ্রামের প্রেসিডেণ্ট ভবতারণ সমাদ্দার কি ভাবে জানি খবরটা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখা করতে এলেন সুজয়ের সাথে।

সুজয় তখন ঘরে বসে তনুকে অঙ্ক শেখাচ্ছিল। এই সময়ে প্রায়ই ও তনুকে অঙ্ক শেখায়।

ভবতারণ বাবু নিজের আগমনের সংবাদটা না জানিয়ে একেবারে সুজয়ের ঘরে গিয়ে উঠলেন। তারপর এক উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন—শুনলাম তুমি নাকি কলকাতায় যাচ্ছ সুজয় ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এ খবর জানলেন কি করে ?

—সে কথা পরে বলবো। কিন্তু এখন কি তোমার যাওয়া ঠিক হবে ?

সামনে ইলেক্‌সান। এই সমস্ত দেখা শুনা করবে কে? আর শুনেছ তো এবার লাটুঘোষ তারিণী চক্রচর্ত্তীকে প্রেসিডেন্ট করার জন্য চেষ্ট করছে।

কথাটি যে অত্যন্ত সত্য সুজয় তা আগেই জানতো। কিন্তু ইলেক্‌সানের ব্যাপার নিয়ে এবার ওর মাথা ঘামাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই। আর তাছাড়া সত্যি যদি সুরেনবাবু ইলেক্‌সান পর্যন্ত গ্রামে থাকেন। তাহলে নিশ্চিত তার সাথে প্রত্যক্ষ কথার সংঘর্ষ বাধবে। যা ওর পক্ষে মোটেই সঙ্গত হবে না।

সুজয় প্রসঙ্গটা না বুঝবার ভাণ করে বলল—তারিণী বাবুকে দাঁড় করিয়ে, লাটু ঘোষের কি লাভ হবে?

—লাভ তার কিছুই নয়। এতদিন চেষ্টা করে সে যখন দাঁড়াতে পারল না। তাই তারিণীকে দাঁড় করিয়ে আমার উপর একটা কূটনৈতিক প্রতিশোধ নিতে চায়। তবে আমি একটি কথা বলে রাখছি সুজয়। লাটু ঘোষ যত চালই দিক না কেন। শালুক পুরের প্রেসিডেণ্টের গদি থেকে ভবতারণ সমাদ্দারের নাম ও কোনদিনই মুছতে পারবে না।

সুজয় মনে মনে ভবতারণবাবুর কথাটি সমর্থন করতে পারল না। সুজয় আন্তরিক ভাবে চায় এবার গ্রামের প্রেসিডেন্ট অন্য কেউ হোক।

কারণ ভবতারণবাবু প্রত্যেকবারই প্রেসিডেণ্ট হবার আগে অনেক কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দেন। আর সেই প্রতিশ্রুতিকে ও সুন্দর ভাবে ভাষা দিয়ে গ্রামের নানা জায়গায় প্রচার কোরে বেড়িয়েছে।

কিন্তু সব শেষে দেখা গেছে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে ভবতারণবাবু তখন অনেক কথাই ভুলে যান। তখন আর তার খেয়াল থাকে না কোথায় কাকে তিনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সুজয় বলল—আপনি তো বছর চারেক প্রেসিডেণ্ট হলেন। এবার ছেড়ে দিন। ওরা এবার কাজ করুক।

ভবতারণবাবু সামান্য আঘাত পেয়ে বললেন—এটা কি বলছ সুজয়।

সাধ কোরে কি কেউ গদি ছাড়ে। আর আমি তো নেহাৎ কম কাজ করিনি।

ষ্টেশনে যাবার পাকা রাস্তা। পাঁচটা নূতন টিউব্-ওয়েল্। ইলেক্ট্রিক বাতি গুলোও কিছু বাড়ানো হবে। আর একটা পাকা নর্দমার কাজ এখনও চলছে। এ সমস্ত তো একেবারে নগন্য নয় সুজয়।

—এ কাজগুলি যে আপনি এক বছরে করেননি। দীর্ঘ চার বছর প্রেসিডেন্ট হয়ে, আপনি এই সামান্য কাজ গুলো করেছেন। আর তাছাড়া এই পাঁচটা নূতন টিউব্-ওয়েলের মধ্যে তিনটি টিউব্-ওয়েলই আপনার পাড়ায় বসিয়েছেন। অথচ যে পাড়ায় একটি টিউব্-ওয়েলের ব্যবস্থা নেই, সেদিকে আপনার একেবারেই নজর পরেনি। তারা এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় এসে জল বয়ে নিয়ে যায়।

ভবতারণবাবুর মুখ গম্ভীর কোরে বললেন—তোমার এ ধরণের কথা বলার উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না সুজয়। অথচ আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তোমাদের সমস্ত টাকাটা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি।

—আপনি টাকার কথা তুলছেন কেন? আপনি কি বলতে চান, আপনার কাছ থেকে টাকাগুলো আমরা অন্যায় ভাবে নিয়েছি।

আপনার হয়ে আমরা খেটেছিলাম। তারই পরিবর্তে আপনি টাকাগুলো দিয়েছিলেন। আর তাছাড়া সে টাকাগুলো কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করা হয়নি। গ্রামে যারা দুঃস্থ, নিজেদের ছেলে মেয়েদের যারা পড়াতে পারে না, স্বজনেরা মারা গেলে যাদের সৎকারের কোন সামর্থ থাকে না, তাদেরই প্রয়োজনে টাকাগুলো খরচ করা হয়েছে। আর এখনও সামান্য কিছু টাকা গ্রামের পাঠাগারের তহবিলে জমা আছে। সেগুলি ঠিক এমনি কাজেই খরচ করা হবে।

ভবতারণবাবু এবার একটা মৃদু ধাক্কা খেলেন। কিন্তু তবুও বললেন—কিসে খরচ করেছ তা তো আমি জানিনে বাপু। তবে থোক

পাঁচশো টাকা গুণে যে তোমাদের হাতে দিয়েছি, তা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

সুজয় আর ব্যাপারটাকে কটু করবার চেষ্টা করল না। তাই সংক্ষেপে বলল—এবার আমি আর আপনার কাজের ভার নিতে পারবো না। আপনি খাদু অথবা হারুকে গিয়ে এ কাজের কথা বলুন।

ভবতারণবাবু এবার কর্কশ গলায় বললেন—বুঝেছি, তোমাকেও হাত করেছে লাটু ঘোষ। নইলে শেষ পর্যন্ত তুমিও কিনা দল ছাড়তে চাও।

সুজয় কোন প্রতিবাদ করল না। শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভবতারণবাবুর দিকে। আর ভবতারণবাবুও সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভেঙ্গে পড়লেন মুহূর্তে।

তাই তিনি এবার এগিয়ে এসে কাতর স্বরে বললেন—দেখ সুজয় এ বছর আমাকে কোনরকম দাঁড় করিয়ে দাও। এইটাই আমার শেষবার। আর আমি দাঁড়াবো না। আমি শুধু লাটু ঘোষকে দেখিয়ে দিতে চাই, কৌশল কোরে ভবতারণ সমাদ্দারকে গদি থেকে সরানো যায় না। অবশ্য তুমি যদি আমার পেছনে থাকো।

ভবতারণবাবুর মনের অবস্থা দেখে সুজয়ের মন নরম হয়ে উঠল। তাই একেবারে ও অস্বীকার করতে পারল না। শুধু বলল—এখন আপনাকে নিশ্চিত কথা দিতে পারছি না। তবে ভোটের সময় যদি আমি গ্রামে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার হয়ে খাটবো।

ভবতারণবাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন—না বাবা, তুমি নিশ্চয়ই থাকবে। তুমি থাকলে নির্ঘাত আমি জিতবো। ঐ লাটু ঘোষ যত চালই দিক না কেন। তোমার মুখের কাছে, তার কোন চালই টিকবে না।

তারপর ভবতারণবাবু আর দাঁড়ালেন না। একটা আশ্বাসের উৎসাহ নিয়ে তিনি হাসিমুখে বিদায় নিলেন সুজয়ের বাড়ী থেকে।

*　　　*　　　*

লাটু ঘোষ শালুকপুরের শেষ প্রান্তে থাকেন। প্রথমে ছিল তার

এক মিষ্টির দোকান। তাতে বসে সে সারাদিনই হাত-পাখা নেড়ে মাছি তাড়াতেন। আর কদাচিৎ খদ্দের এলে হাসিমুখে মিষ্টি বিক্রি করতেন।

কিন্তু এতে তার সংসার চলতো না। তাই একদিন কার পরামর্শে মিষ্টির দোকান বিক্রি করে নেমে পড়লেন মাছের ব্যবসায়। বছর দুয়েক ঘুরতে তার ব্যবসা উঠলো ফেঁপে। বেশ দুটো পয়সা তিনি ঘরে বাঁধলেন। ধীরে ধীরে গ্রামে পাকা বাড়ী তুললেন। তারপর বাড়ীতে বসালেন নলকূপ।

সঙ্গে সঙ্গে লাটু ঘোষের নামের পেছনে বাবু যুক্ত হলো। আগে যারা শুধু লাটু বলে ডাকতো, এখন তারা লাটুবাবু বলে ডাকে। আর যারা বয়সে বড় ছিল, তারা অবশ্য নাম ধরেই ডাকে। তবে তাদের ডাকের পেছনে বিগলিত স্নেহ আর মধু যেন ঝোরে পড়ে এখন।

লাটু ঘোষ এই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর মনে মনে খুব খুশীও হয়েছিলেন। কারণ অর্থের মহিমা তার সামাজিক কৌলিন্যকে অনেকটা প্রশস্ত করে তুলেছিল। তাই গ্রামে আজ কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হলে, তাকে দেখা যায় গণ্যমান্যদের মধ্যে।

গ্রামের অনেকে তখন লাটু ঘোষের বাড়ী থেকে জল নিতে আসতো। তাদের মধ্যে অনেকে বলতো—ভাগ্যি লাটুবাবু নিজের বাড়ীতে টিউব্-ওয়েল বসিয়েছিলেন। নইলে কি অবস্থা না হোতো আমাদের।

কথাটা সেদিন লাটু ঘোষের কাণে গিয়েছিল। তাই একদিন বলেছিলেন—গ্রামের প্রেসিডেন্ট কি করছে? তাকে ভাল করে ধরতে পারেন না। তিনি তো আপনাদের সুখ-সুবিধার জন্যই রয়েছে।

তাই দিন কয়েক পরে গ্রামের কয়েকজন প্রৌঢ় বলেছিলেন—এক কাজ কর লাটু, সামনের ইলেক্সানে তুমি গ্রামের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য দাঁড়াও। আমরাই তোমাকে সমর্থন করবো। দেখি ভবতারণ কি কোরে দাঁড়ায়।

কিন্তু লাটু ঘোষ প্রথম দিকে তেমন গরজ দেখাননি। কারণ তিনি একা মানুষ। কারবার দেখবেন না ভোটের কথা ভাববেন। আর

তাছাড়া প্রেসিডেণ্ট হবার বাসনা তার মনে কোনদিনই ছিল না। সুতরাং এই প্রস্তাবটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে, এক রকম দূর করে দিয়েছিলেন মন থেকে।

কিন্তু গ্রামের তারা নাছড়বান্দা। আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—তুমি কিছু ভেবো না লাটু, আমরাই তোমার সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি শুধু কাজের প্রাথমিক খরচটা ব্যবস্থা করে দাও।

সেদিন সারা রাত্রি লাটু ঘোষ একথা ভেবেছিলেন। ভোটে নামটা তারপক্ষে উচিত হবে কিনা। শেষটায় ভাবলেন—মন্দ হবে না। সামান্য কিছু টাকা পয়সা খরচ করে, যদি নামটা কেনা যায়, মন্দ কি। তারপর ভবতারণের মত ফুলের মালা গলায় দিয়ে, কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে সারা গ্রাম মাৎ করে দেবেন।

পরদিনই তাদের ডেকে লাটু ঘোষ তার স্ব-ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছিলেন। তারা প্রশংসা করে বলেছিলেন—তুমি যদি সাহস করে এগিয়ে না আস, তাহলে এ কাজে আসবে কে বলতো? তোমার অর্থ আছে। মান আছে। তুমি দাঁড়ালে নিশ্চয়ই তোমাকে লোকে ভোট দেবে।

লাটু ঘোষ তখন বিনয় করে বলেছিলেন—তা আপনাদের ইচ্ছে। আপনারা যদি মনে করেন—আমি প্রেসিডেণ্ট হবার উপযুক্ত লোক। আমাকে তা মানতেই হবে। আর না মানাটাই যেন আপনাদের কাছে অপরাধ করা হবে।

তারপরই গ্রামে প্রচার হলো লাটু ঘোষ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী। খবরটি শুনে গ্রামের লোকেরা খুব অবাক হয়েছিল। কারণ এমন একটি ব্যাপারে যে লাটু ঘোষ এগিয়ে আসবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। পরে জানতে পেরেছিলেন এ ব্যাপারে গ্রামের বৃদ্ধেরা লাটু ঘোষকে পরামর্শ দিয়েছে।

খবরটি পেয়ে ভবতারণবাবু বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সবে তিনি তখন একবার মাত্র প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। তাই তখনও তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি।

কিন্তু সুজয়দের দল ভরসা দিয়ে বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না। দেখবেন সব ভোটই আপনার বাক্সে পড়েছে। আর ওরা তো সব বুড়োর দল। আমাদের মত কি আর খাটতে পারবে।

কথাটি যে অতি সত্যি, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যে হলেই দেখা যেতো লাটু ঘোষের আস্তানায় যতসব বুড়োর দল। কারো গায়ে চাদর জড়ানো। আবার কারো পায়ে মোজা পরা। তারপর তো তামাকের ব্যবস্থা আছে। তামাক টেনে তারা কথা বলবে না কাসবে, সে ছিল আরেক সমস্যা।

কেউ তখন কথা বললে, তার অর্দ্ধেক কথা হারিয়ে যেতো কাসির চোটে। পাশ থেকে তখন আরেক বুড়ো বলতো—তুমি বাপু একটু মাঝে মাঝে চ্যবন প্রাশ খেয়ো। এমন কাশি কিন্তু আজকাল ভাল নয়। একটু সাবধান হও।

এমনি ভাবে চলতো লাটু ঘোষের ভোটের কাজ। তারপর ভোট গণনার শেষে দেখা গেছে লাটু ঘোষের আস্তানা একেবারে শূন্য। যেখানে দিবারাত্র কড়া তামাকের গন্ধ আর তুমুল কাশির শব্দ শোনা যেতো, সেখানে আর মানুষের ছায়া পর্যন্ত পড়তো না।

এমনি ভাবে যেত সপ্তাখানেক। তারপর আবার একে একে সবাই এসে ভীড় জমাতো লাটু ঘোষের আস্তানায়। আশ্বাস দিয়ে তারা বলতেন—মন খারাপ কোরো না লাটু। এবার হেরে গেছ। সামনের বার যেমন করেই হোক তোমাকে জেতাবো।

লাটু ঘোষ তখন কোন উত্তর দিতেন না। রাগে আর দুঃখে তিনি তখন গুম্‌ মেরে বসে থাকতেন। আর মাঝে মাঝে বলতেন—আপনারা শুধু শুধু আমাকে ভোটে নামিয়েছেন। কি দরকার ছিল এমন ঝামেলায় আনার।

এইভাবে আরও কয়েকটি বছর কেটেছে। আর প্রত্যেক বারই লাটু ঘোষ ভোটে নেমে ভবতারণবাবুর কাছে হেরেছেন।

কিন্তু ইদানিং লাটু ঘোষ আর আগের মত নেই। কয়েকবার ঘা

খেয়ে তার মাথায় কূটনীতির খেলা অনেক খুলে গেছে। এখন তিনি স্পষ্ট বোঝেন, ভবতারণবাবুর সাফল্যের মূলে আছে গ্রামের যুবশক্তির দল। ওরা আছে বলেই ভবতারণবাবু অতি সহজেই প্রত্যেকবার জিততে পারছেন।

অথচ তিনি টাকা পয়সা কম খরচা করেননি। বরং ভবতারণবাবুর খরচার দ্বিগুন অর্থ তিনি খরচ করেছেন। কিন্তু আসল জিনিষের অভাব থেকে গেছে লাটুঘোষের।

লাটুঘোষ জানেন। সেটা হলো তবে দলের আন্তরিকতার অভাব। শুধু টাকা দিয়ে এই আন্তরিকতা আনা যায় না। টাকা দিয়ে কেবল দলের সংখ্যা বাড়ানো যায়। তাই লাটু ঘোষের দলের সংখ্যা ভবতারণ বাবুর দলের চেয়ে অনেক বেশী।

লাটুবাবু আর একটি দিকও ভেবে দেখেছেন। সেটি হলো তার দলের কর্ম্মীরা। বয়সে তারা প্রাচীন। কাজ করবার ইচ্ছে থাকলেও শরীরে তাদের কুলোয় না। একটু বেশী যারা খেটেছে। তারাই ক'দিন পরে বিছানা নিয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত কাজে শক্ত আর সামর্থ লোকের দরকার।

কিন্তু এছাড়া যে তার কোন উপায় ছিল না। কারণ এই বয়স্ক কর্ম্মীরাই তাকে একদিন ভোটের যুদ্ধে নামিয়েছিল। সুতরাং তাদের তিনি কি কোরে আর বাদ দেবেন।

এইভাবে সাত পাঁচ ভেবে তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন গ্রামের কিছু যুবককে তিনি সংগ্রহ করবেন। তাদের তিনি কাজে লাগাবেন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে। তাই এক রাত্রিতে লাটুবাবু গোপনে দেখা করেছিলেন সুজয়ের সাথে।

দরজা খুলে সুজয় সেদিন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। কারণ লাটুবাবু যে ওর দরজায় আসবে তা ও কোনদিনই ভাবতে পারেনি।

লাটুবাবু সুজয়ের বিস্মিত মুখ দেখে বলেছিলেন—খুব অবাক হলে সুজয়?

সুজয় তখন কোনস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি।

কিন্তু লাটু বাবু স্পষ্ট বলেছিলেন—কূটনীতিতে সব কিছুই চলে সুজয়। এতে কোন সঙ্কোচ রাখতে নেই। তাই আমি স্পষ্ট বলছি, তোমার কাছ থেকে আমি কিছু সহযোগিতা চাই।

সুজয়ের বিস্ময়ের ঘোর তখন কেটে গেছে। তাই সুজয় বলেছিল—বেশ তো, আপনি কি সহযোগিতা চান বলুন?

—অবশ্য সেটা তুমি বুঝতে পারছ। তবে এ সহযোগিতার পেছনে আমার কিছু দাবী আছে। নিছক শুধু আমি গ্রামের প্রেসিডেণ্ট হতে চাই না। আজ ক' বছর তো তোমরা ওকে দাঁড় করিয়েছো। কিন্তু সত্যি কোরে বলতো, কতটুকু কাজ পেয়েছ ওর কাছ থেকে?

সুজয় তখন চুপ করেছিল। জবাবে ও বিরোধিতা করবে না স্বীকৃতি দেবে, এটাই তখনও ভাবছিল। কিন্তু লাটু বাবুর প্রশ্নটা যে অতি নির্ম্মম সত্য। এটাকে যে অতি সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

এই প্রশ্ন ঘরের বাইরে হলে, এতক্ষণে সুজয় বিরোধিতাই করতো। এত দ্বিধা বা বিবেচনার কোন প্রশ্নই আসতো না। কারণ সেখানে দলের সমষ্টিগত শক্তির প্রভাবই বেশী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকলেও তা যে মত প্রকাশের অনুকূল নয়।

তাই সুজয় বলেছিল—আপনি যে ত্রুটি উল্লেখ করেছেন, তা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যে নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছি।

—নিষ্কর্মা তুমি হওনি। যদি তুমি সত্যি ত্রুটি বুঝে থাকো, তাহলে এগিয়ে আসো আমার স্বপক্ষে।

সুজয় তখন সত্য বুঝেও দ্বিধামুক্ত হতে পারেনি। মনের গহনে কোথায় যেন এক বাঁধন ওকে আটকে দিয়েছে।

তাই বলেছিল—এই মুহূর্তে আপনাকে আমি কোন কথা দিতে পারছি না। আর তাছাড়া এবার ভোটের সময় আমি গ্রামে থাকবো কিনা, তাও একপ্রকার অনিশ্চিত। সুতরাং আমাকে এবার আপনি বাদ দিতে পারেন।

লাটু বাবুর উৎসাহ তখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন—দলের শিরোমণিকে একবার খাঁচায় ঢোকাতে পারলে, তাকে আর কে পায়। চোখ বুজেই তিনি তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একেবারে গ্রামের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন।

কিন্তু তা আর যখন সম্ভব হলো না। তাই একান্ত নিরুপায় হয়ে, তিনি ফিরে এসেছিলেন সুজয়ের কাছ থেকে।

তারপরই তিনি স্থির করেছিলেন এবার আর তিনি ভোটে নামবেন না। কারণ এবারও যখন তিনি ভোটে জিততে পারবেন কিনা অনিশ্চিত, তখন আর এ বিষয়ে না এগোনই সঙ্গত।

আর তাছাড়া প্রত্যেকবারই এক ব্যক্তির কাছে হেরে গিয়ে তিনি নিজের কাছে কম লজ্জা পাননি। মাঝে মাঝে অবশ্য ভেবেছেন, এবার তিনি তার নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু মনের এক ক্ষীণ আশাই এই প্রত্যাহারের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই লাটুবাবু এবার শক্ত হয়ে নিজের শরীরের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ালেন ভোটের থেকে। আর সেই সঙ্গে তারিনী চক্রবর্ত্তীর নামটি পেশ করবার ব্যবস্থা করলেন। যাতে তাকে ভোটে নামিয়ে ভবতারণ সমাদ্দারকে কাৎ করা যায় অতি সহজে।

পথে একদিন সকালে লাটুবাবুর সাথে তারিণী চক্রবর্ত্তীর দেখা হলো। তারিণীবাবু অবশ্য এই সময়ে প্রতিদিনই প্রাতঃভ্রমণ করেন। রাস্তায় দেখা পেয়ে লাটু ঘোষ প্রাতঃ নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন—আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম তারিণীদা।

তারিণী বাবু তখন ঈষৎ কৌতুহলী হয়ে বলেছিলেন—আমার বাসায় ?

—হ্যাঁ তারিণীদা। আজকে রাত্রির দিকে আমার বাসায় একবার আসুন। আপনার সাথে কিছু দরকারী কথা আছে।

তারিণীবাবু আর বিশেষ কিছু বলেননি। সেদিন রাত্রিতেই উপস্থিত হয়েছিলেন লাটু ঘোষের বাসায়।

ঘরে তখন গ্রামের আরো পাঁচজন ছিল। তারিণীবাবু এই দৃশ্য দেখে প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কারণ তার সাথে এমন কি কথা থাকতে পারে, যার জন্য রাত্রিতে আরো পাঁচজন লোকের উপস্থিত প্রয়োজন। তাই এক অজানা আশঙ্কায় তারিণীবাবু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু লাটু ঘোষ তার প্রস্তাবের কোন ভূমিকা না করেই বলেছিলেন—আপনাকে তারিণীদা ভোটে দাঁড়াতে হবে। আমি এবার শরীরের অসুস্থতার জন্য দাঁড়াবো না। তাই আমরা সবাই ঠিক করেছি, আপনাকে গ্রামের প্রেসিডেন্ট করবো।

কথাটি তারিণীবাবুর নিকট একেবারে ধাঁধার মত মনে হলো। তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন—এটা কি বলছ লাটু। ভোটে দাঁড়ানো কি আমার সাজে। দেখতেই তো পারছ আমার শরীরের অবস্থা। আর তাছাড়া ভোটে দাঁড়াবার মত সঙ্গতিও আমার নেই। এযে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন।

—টাকা পয়সার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না তারিণীদা। যা টাকা পয়সা খরচ হবে, সব আমি দেবো। আপনি শুধু সম্মতি দিন। তাহলেই আমাদের কাজ হবে। আপনাকে আর কোন বিষয়ে ভাবতে হবে না।

তারিণীবাবু আর কথা খুজে পেলেন না। শুধু অর্থহীন ভাবে ঘরের চারিদিকে তাকালেন। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মুখের ভাব অনেক পরিবর্তন হলো। তাই বোঝা গেল খুব একটা আপত্তির কারণ নেই এই প্রস্তাবে।

পরবর্তী পর্য্যায়ে লাটু ঘোষ সুরেনবাবুর বাসায় গেলেন। সঙ্গে তারিণীবাবুও ছিলেন।

প্রথমে তারিণীবাবুই কথা উত্থাপন করলেন। বললেন, দেখ সুরেন, লাটু কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

সুরেন বাবু মৃদু হেসে বললেন—নিশ্চয়ই নূতন কিছু?

এবার লাটু ঘোষ বললেন—হ্যাঁ সুরেনদা। এবার আমরা ঠিক করেছি, তারিণী দাদাকে ভোটে নামাবো। এতে আপনার কি মত ?

সুরেন বাবু অমায়িক হেসে বললেন—এতে আমার কি মতামতের আছে লাটু। আমি কি এখন গ্রামে থাকি ? তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।

—তা হয়না সুরেনদা। এবার আপনি যখন গ্রামে রয়েছেন। তখন আপনার মতটা আমাদের নেওয়া দরকার।

সুরেন বাবু কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন—দেখ লাটু, শালুকপুর বড় গ্রাম। আর তার লোকও অনেক বেশী। তাই এই নামে একদিন রেলস্টেশন হয়েছে। সুতরাং এই গ্রামের দায়িত্ব তোমাদের কিছু কম নয়। গ্রামের যা কিছু উন্নতি সব তোমাদের উপর নির্ভর করছে। এতে তোমরা যা ভাল বুঝে করবে, আমিও তাই সমর্থন করবো।

এমন আন্তরিকপুর্ণ কথা শুনে লাটু ঘোষ এবার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। কারণ মহৎ সত্যের কাছে, মিথ্যে যে কখনও স্বাভাবিক হতে পারে না ।

লাটু ঘোষ তার অস্বস্তি কাটিয়ে বললেন—আমিও চাই সুরেনদা, গ্রামের কিছু উন্নতি হোক। আর এজন্য তারিণীদাকে আমরা ভোটে নামাতে চাচ্ছি। তিনি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। আর সর্বজন পরিচিত। তাই অনেকেরই তারিণীদার উপর আস্থা আছে।

তারপর ভৃত্য চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে সুরেন বাবু বললেন—কিন্তু ভোটের দিন পর্যন্ত তো আমি থাকতে পারছি না তারিণী। এর আগেই আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।

তারিণী বাবু এবার হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন—চেষ্টা করে দেখ। যাতে এ কটা দিন থেকে যেতে পারো। আর তুমি বুঝতেই পারছো, তোমার উপস্থিতি কতটা প্রয়োজন।

তারপর লাটু ঘোষ বিষন্ন মনে চেয়ার থেকে উঠলেন। সঙ্গে তারিণী বাবুও ক্ষুণ্ণ মনে ঘর থেকে বিদায় নিলেন।

॥ ৮ ॥

শেষ পর্যন্ত সুজয় কলকাতার দিকে পা বাড়ালো। যাবার দিন রাস্তায় সুজয়ের সাথে তনুর দেখা হলো। তনু তখন ঝাল নুন দিয়ে গোবরা তেঁতুল খাচ্ছিলো, আর পকেটেও ছিল খান কয়েক তেঁতুল।

সুজয়ের হাতে স্যুটকেশ দেখে, তনু সবিস্ময়ে বলল—কোথায় যাচ্ছ সুজয়দা ?

সুজয় আদর করে তনুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—কলকাতায় যাচ্ছিরে। আর কিন্তু দুষ্টুমী করিস না। দেখিস ফেরবার সময় তোর জন্য ব্যাট্ বল নিয়ে আসবো।

তনু আনন্দে জিজ্ঞাসা করলো—কবে ফিরবে সুজয়দা ?

—এই তো সপ্তাখানেকের মধ্যে।

তনু আনন্দের উৎসাহে রেলষ্টেশন পর্যন্ত এসে পড়লো। বলল—লাল বল আনবে কিন্তু।

—আচ্ছা তাই আনবো। এখন বাড়ী যা। অনেকদূর এসে পরেছিস।

তনু এবার পকেট থেকে গোটা কয়েক গোবরা তেঁতুল বার করলো। আর তার সাথে কিছু কাগজে মোড়া ঝাল নুন সুজয়ের হাতে দিয়ে বলল—এগুলো খেয়ো সুজয়দা। এগুলি আমি চুরি করিনি। দত্ত বাগানের গাছ তলায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

তনুর কথা শুনে সুজয় অবাক হলো। আর ওর চিন্তার গ্রন্থিতে যেন এক বিদ্যুৎ স্পর্শ করলো। সুজয় বুঝতে পারলো, সেদিনকার ফুল চুরির ব্যাপারটা এখনও তনুর মনে কাল দাগ কেটে আছে। তাই আজ তনু এই কথা বলল।

তনুকে সাদরে জড়িয়ে ধরে সুজয় বলল—নিশ্চয়ই খাবো তনু।

কেন খাবো না? তুই কি দেখেছিস, তোর দেওয়া জিনিষ আমি কোনদিন খায়নি?

তনু মুখ নীচু করে রাখল। যেন সেদিনের ঘটনাটা স্মরণ করে, সহস্র মনের লজ্জা যেন আজ ওকে ঘিরে ধরেছে।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে পড়ল। সুজয় তাড়াতাড়ি একটি টিকিট কেটে কামরায় গিয়ে উঠলো। ট্রেনটি একটি সতর্ক ধ্বনি দিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

গতি তার অনেক মন্থর। সুজয় এই মন্থর গতিতে স্পষ্ট দেখতে পেলো তনুকে। তনু তখন ব্যাটবলের কথা ভুলে গিয়ে প্লাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে।

* * *

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে সুজয় বিস্মিত হলো না। কারণ এর আগেও কয়েকবার ও কলকাতায় এসেছিল। তাই খুব সহজেই হ্যারিসন রোডের এক মেসবাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

সুজয় প্রথমে ভাবতে পারেনি এটা যে মেস বাড়ী। কারণ এটা ঠিক একটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়ীর মতই মনে হয়েছিল। সদ্য নূতন রঙ্ লাগানো হয়েছে দেওয়ালে। জানালা কপাটের রঙ্গুলো পর্যন্ত চক্ চক্ করছিল। কিন্তু বাড়ীর দরজার উপর ছোট একটি প্লাষ্টিক প্লেটের উপর কালো হরফে লেখা ছিল মেসবাড়ী।

লেখাটি পড়ে সুজয় বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই দ্বিধাগ্রস্থভাবে ও বাড়ীটির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। তারপর চেয়ে দেখলো, দরজার কোনায় একটি কলিং বেল লাগানো রয়েছে।

সুজয় ভাবলো নিশ্চই এটা গৃহস্থের বাড়ী। নইলে কোন মেস-বাড়ীতে আবার কলিং বেল থাকে নাকি? ঠিক এমনি সময় একটি সুসজ্জিত ভদ্রলোক বেড়িয়ে এলেন বাড়ীটি থেকে।

সুজয়কে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চান ?

সুজয় একটু সঙ্কোচ করে বলল—আচ্ছা এটা কি মেসবাড়ী ?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে আঙ্গুল দিয়ে প্লাষ্টিক প্লেটটা দেখিয়ে বললেন—লেখাটি পড়ে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

ভদ্রলোকের অমনি কথা বলার ভঙ্গী দেখে সুজয় একটু আশ্চর্য্য হলো। বলল—না বিশ্বাসের কিছু নয়। তবে এতবড় বাড়ীতে ছোট করে মেসবাড়ী লেখা কি না। তাই একটু আশ্চর্য্য লাগছিলো।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন। বললেন—এটা মেসবাড়ী হলেও অন্য মেসের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তারপর ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলেন বাস রাস্তার দিকে।

সুজয় বাড়ীটির মধ্যে ঢুকলো। খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে একটি ঘর। সেই ঘরের দরজার উপর ইংরাজীতে লেখা রয়েছে অফিস রুম।

অফিস ঘরে বসেছিলেন তখন মেস মালিক দীননাথবাবু। তিনি তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। চোখে তার চশমা। দৃষ্টিতে এক অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। পরনে পরিষ্কার একটি ধুতি কাপড়। আর গায়ে তার একটি পাঞ্জাবী।

সুজয় এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলো— এখানে কোন সীট্ খালি আছে কী ? দীননাথবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে বললেন—কী কাজ করা হয় ?

—আজ্ঞে গ্রামে মাষ্টারী করি।

—এখানে কি উদ্দেশ্য ?

—চাকরীর চেষ্টায়।

—তবে তো লক্ষণ ভাল নয়।

—কি বললেন ?

—বলছিলাম এক মাসের টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে।

সুজয় এবার অস্বস্তি বোধ করলো। বলল—আজ্ঞে অতদিন যদি না থাকি ?

—হুঁ, তাহলে দেখছি লক্ষণ আরো খারাপ।

সুজয় এবার রুক্ষ স্বরে বলল—আপনি এভাবে কেন কথা বলছেন ? দীননাথবাবু এবার খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন। এতক্ষণ তিনি খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রেখেই কথা বলছিলেন। এক পলকে সুজয়ের সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বললেন—সেলফ্ রেসপেক্ট আছে দেখছি।

সুজয় এবার কথায় মাত্রা দিয়ে বলল—আপনার এভাবে কথা শুনতে আমি আসিনি। পছন্দ না হয়, বলে দিন। আমি অন্য মেস দেখে নেবো।

—দাঁড়াও বাপু। অত রাগ করা উচিত নয়! যা দিনকাল পড়েছে। একটু ভাল করে দেখে শুনে নিতে হয়। তারপর দীননাথ বাবু কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করলো সুজয়কে।

সুজয় ও আর কোন কথা না বলে, পনেরো দিনের টাকা গুণে দিলো দীননাথবাবুকে। দীননাথবাবু একটি ভৃত্য ডেকে সুজয়কে আট নম্বরের ঘরে নিয়ে যেতে বললেন।

ভৃত্যটি অবাক হয়ে বলল—আপনি ভুল করছেন বাবু। সে ঘরে তো কোনদিনই ভাড়া দেওয়া হয় না। সেটা যে আপনার বসবার ঘর।

মুখ গম্ভীর করে দীননাথবাবু বললেন—আমার ভুল হয়নি। তুই নিয়ে যা ওঘরে।

ভৃত্যটি আর কোন কথা না বলে নিয়ে গেল সুজয়কে সে ঘরে। ঘরে ঢুকে সুজয় অত্যন্ত বিস্মিত হলো। কারণ এমন রুচি সম্মত লাইব্রেরী ঘর সুজয় এই প্রথম দেখলো। আর এই ঘরেই যে ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে, তাও ভাবতে পারল না।

সুজয় দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বলল—কিহে ভুল করে আননিতো ?

—আজ্ঞে বাবুকে তো তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ছোট স্যুটকেশটা একপাশে রেখে সুজয় অত্যন্ত সঙ্কোচের সাথে একটি চেয়ারে বসলো।

ভৃত্যটি বলল—আপনি বিশ্রাম করুন বাবু। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি।

মিনিট কুড়ি বাদে ভৃত্যটি জল খাবার নিয়ে এলো। সুজয় তখন একই ভাবে চেয়ারে বসেছিল! তাই দেখে ভৃত্যটি বলল—সেকি বাবু এখনও বসে আছেন? হাত মুখ ধোননি।

সুজয় মৃদু হেসে বলল—তোমার নাম তো এখনও জানলাম না। তোমাকে কি বলে ডাকবো।

ভৃত্যটি একটি বৃহৎ নিঃশব্দ হাসি দিয়ে বলল—আজ্ঞে সনাতন বলেই ডাকবেন। এই নামেই আমাকে সবাই ডাকে।

—আচ্ছা সনাতন তোমার বাবু উপরে আসেন কখন?

—তা রাত প্রায় এগারোটা হবে।

সনাতন এবার জিভ কেটে বলল—ঐ দেখুন আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। আপনাকে বাবু আলমারির চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি যে কোন বই খুলে পড়তে পারেন।

সুজয় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে চাবিটি রাখলো।

এবার সনাতন কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা দাদাবাবু, আপনি কি আমার বাবুকে চেনেন?

—কেন বলতো?

—তাই তো মনে হচ্ছে দাদাবাবু। এমন ব্যবহার তো বাবু আর কারো সাথে করেনি। আর এ ঘরে বাবু কোনদিন কাউকে ঢুকতেও দেননি।

সুজয় কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বলল—নারে, আজই তোর বাবুর সাথে নূতন আলাপ হলো।

সনাতন বিশ্বাস করলো না। বলল—না দাদাবাবু, একথা বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই আপনি চেনা লোক।

সুজয় তার কোন জবাব দিল না। শুধু সনাতনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

রাত্রির খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। সুজয় অপেক্ষা করছে দীননাথবাবুর জন্য। দীননাথবাবু এলে তার সাথে ও কিছু কথা বলবে। তাই এই সময় কাটাবার জন্য সুজয় ঘুরে ঘুরে প্রত্যকটি আলমারির বইগুলো দেখলো।

সমস্ত বইগুলো দেখে সুজয় মুগ্ধ হলো। দর্শন আর সাহিত্যের কোন বই যেন বাদ পরেনি। স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে অসীম জীবন জিজ্ঞাসার গ্রন্থিগুলো।

বইগুলো দেখে বোঝা গেল এগুলি আজকের নয়। বহুদিনের পুরানো সংগ্রহ। বইয়ের পাতাগুলোও কিছুটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবে দেখে বোঝা যায়, দীননাথবাবুর যত্নের কোন ত্রুটি নেই বইগুলোর উপর।

দেওয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করলো। সারা দিনের ক্লান্তিতে সুজয়ের এবার ঘুম পেলো। সুজয় টেবিল থেকে একখানি মাসিক পত্রিকা তুলে নিয়ে, দেহ খানা এলিয়ে দিল একটি ইজিচেয়ারের মধ্যে।

ঠিক রাত এগারোটায় দীননাথবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুজয় তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। খোলা জানালা দিয়ে উত্তুরে হাওয়া ঘরে ঢুকছে। বাতাসের হিমেল স্পর্শে দীননাথবাবু ঠাণ্ডা অনুভব করলেন। তাই তিনি এগিয়ে এসে ঘরের জানালাটি বন্ধ কোরে দিলেন। তারপর একখানি বই নিয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের শয়ন ঘরের দিকে।

পরদিন সকালে সুজয়ের দেখা হলো দীননাথবাবুর সাথে। দীননাথ বাবু সহাস্যে বললেন—কালকে বোধহয় ভাল ঘুম হয়নি ?

সুজয় সপ্রতিভ হয়ে বলল—অমন ঘরে আবার ঘুম হবে না।

কথার সুত্র পরিবর্ত্তন করে সুজয় বলল—আপনি এত সুন্দর বই গুলো সংগ্রহ করেছেন। যা নিজের মুখে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

—একি আজকের বই। বিশ বছর ধরে বইগুলো আমি বুকে ধরে রেখেছি। বইগুলো এখন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

দীননাথবাবু এবার তন্ময় হয়ে পরলেন। তিনি আবার বললেন—একটা কথা কি জানো? জীবনের সব কিছু অনুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা আর আদর্শ একক জীবনে কখনও পাওয়া যায় না। কিন্তু বইয়ে সেই বিচিত্র জীবনের সব কিছুরই স্বাদ পাওয়া যায়।

কি অপূর্ব সেই জীবনের গতিগুলো। কখনও মনে হবে না, এই জীবনগুলো শুধু ভাষা আর ভাবের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। একটা গভীর সহানুভূতি তার জীবনকে জানবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাই এমন জীবনের রূপগুলো লেখা যায়। শুধু মিথ্যা কল্পনা আর অবাস্তবতার মাঝখানে দাড়িয়ে এমন সত্য জীবনকে কখনও লেখা যায় না।

কথাগুলো শুনে সুজয়ের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো। কারণ এমন গভীর উপলব্দি পুর্ণ কথাগুলো সুজয় আর কোনদিনই কার কাছ থেকে শোনেনি। আর এমন জীবন ভাবনার লোক যে ঠিক একজন মেস মালিক হবেন, তা যেন সুজয় ভাবতেও পারেনি। তাই এমন আশ্চর্য্য লোকের সান্নিধ্য লাভ করে সুজয় মনে মনে নিজেকে ধন্য বোধ করলো।

*　　　　*　　　　*

সুজয়ের সাথে সেই ভদ্রলোকের দেখা হলো। যার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এই মেস বাড়ীর দরজায়। সুজয়কে মেসে দেখে, ভদ্রলোক ভ্রুকুঁচকে বললেন—আরে, আপনি পাশ পোর্ট পেয়ে গেছেন?

সুজয় মৃদু হেসে বলল—কোথায় আর যাবো বলুন! তাই এখানেই পাশ পোর্ট নিয়ে নিলাম।

—যাক ভালই হলো। এবার তাহলে পরিচয়টা সেরে নিই। আমার নাম বটুক নন্দী। আজ পাঁচ বছর এই মেস বাড়ীতে আছি। কাজ করি তিনটে ফার্মে।

সুজয় একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—বলেন কি, লোকে একটা ফার্মে কাজ পায়না। আর আপনি তিন তিনটে ফার্মে কাজ করেন।

—তা আপনাদের আশীর্বাদে সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তবে একটা কি দুঃখ জানেন, তিনটে ফার্মে কাজ করি বটে। কিন্তু একটাতেও রেগুলার টাকা পাই না।

—রেগুলার টাকা মানে ?

ঐ দেখুন আসল ব্যাপারটাই বলা হয়নি। তিনটে ফার্মে কাজ করি মানে, সেখানে আমি মাহিনা করা চাকরি করি না।

—তাহলে ?

—কমিশনে কাজ করি। আর সেই কমিশনের টাকা আদায় করতে আমার নিজের শ্রাদ্ধ করতে হয়।

সুজয় আগের মতই অস্ফুট শব্দ কোরে বলল—শ্রাদ্ধ করতে হয় ?

বটুকবাবু মাথা নেড়ে বললেন—শ্রাদ্ধ করতে হবে না ? বিলের টাকা পাওয়ার পর মালিক যে তখন সব কথা ভুলে যান। ভাবেন মাল গুলো তার হেঁটে হেঁটেই বিক্রি হয়ে গেছে। এর পেছনে যে একটা লোক সারাদিন ঘাম ছুটিয়ে পরিশ্রম করেছে, তা যে তিনি ভুলেও মনে করতে চান না। আর মালিকের সেই ভুলো মনটাকে ঠিক রাখবার জন্যে তখন আমার শ্রাদ্ধ শুরু হয়।

যেমন ধরুণ রোজ একবার করে তাগাদা। বেশ বিনয় কোরে বলতে হবে, আজ টাকার ভীষণ দরকার। নইলে ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে যাবো স্যার।

যদি এভাবে কাজ না হয়। বলতে হবে—দেখুন এভাবে আমার চলছে না। আমার অসুবিধাটা একটু ভেবে দেখুন।

এর বেশী কিছু বলতে গেলে। মালিক মুখ গম্ভীর কোরে বলবেন—দেখুন আপনার অসুবিধার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি অন্য ব্যবস্থা করে নিন। আর আপনার পাওনা টাকাটা মাসে মাসে এসে নিয়ে যাবেন।

তাহলেই বুঝে দেখুন অবস্থাটা। আর ঐ আর্থিক দুরাবস্থার জন্যই আজ পর্যন্ত বিয়ে করার ভরসা পেলাম না মশাই।

একথা বলে বটুকবাবু জিভে কামড় দিলেন। বললে—ইস্ দেখলেন তো, মনের কথাটা কি ভাবে বেড়িয়ে পড়লো। আজ পর্য্যন্ত কাউকে একথা বলিনি। কিছু মনে করবেন না কিন্তু।

সুজয় অবাক হলো বটুকবাবুর কথা শুনে। কেমন অন্তরঙ্গ ভাবে মনের কথা গুলো সুন্দর ভাবে বলে গেলেন। একটুকু সঙ্কোচ বোধ করলেন না।

বটুকবাবু আবার বললেন—আমার কথা তো সব শুনলেন। কই আপনার কথা তো কিছু বললেন না ?

সুজয় সলজ্জ ভাবে বলল—আমার নাম সুজয় রায়। গ্রামের এক ইস্কুলে মাষ্টারী করি। এখানে এসেছি চাকরির চেষ্টায়।

—গ্রামে মাষ্টারী করছিলেন, সেই তে ভাল ছিল। এখানে কি সহজে চাকরী পাবেন। আর জানেন তো আজকাল কার ব্যাপার। শুধু এডুকেশন থাকলে কিছু হয় না। একটা একষ্ট্রা কিছু থাকা প্রয়োজন। অথবা খুঁটির জোর থাকা দরকার। নইলে তেমন কোন সুবিধা করতে পারবেন না।

সুজয় একটু মুষড়ে পড়লো। বলল—একষ্ট্রা মানে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না ?

বটুকবাবু আন্তরিক হেসে বললেন—না, আপনার সাথে এভাবে কথা বলাটা আমারই ভুল হয়েছে। সবে দেশ থেকে এসেছেন। তাই কলকাতার সব টেক্‌নিকাল ওয়ার্ড গুলো চট করে বুঝতে পারেন না।

—একষ্ট্রা মানে, একটা কোয়ালিফিকেশান্। যেমন ধরুণ টাইপ জানা। ভালো ফুটবল খেলোয়ার। অথবা একজন ভালো ক্রিকেটার, এই সমস্ত জানা থাকলে খুব একটা চাকরি পাওয়ার অসুবিধা হয় না।

—তা আপনি জানেন এ সমস্ত ?

সুজয় হতাশ হয়ে বলল—সেতো চাকরি পাওয়ার মত খেলা জানি না।

—তাহলে টাইপ নিশ্চয় জানেন ?

—আজ্ঞে তা ও নয়।

বটুক বাবু খাটো গলায় বললেন—টাইপটা তো জানা উচিত ছিল। জানেন তো চাকরীর বাজারে ওটা এখন কম্‌পালসারি হয়ে গেছে। তবে চেষ্টা করে দেখুন, কার ভাগ্যে কি লেখা আছে বলা যায় না।

তবে ইতিমধ্যে আপনাকে কয়েকটি টিউশুনি যোগাড় করে দিতে পারবো। এটা পেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু গানের টিউশুনি হলে আরো ভাল হতো। আজকাল বড় লোকদের বাড়ীতে ওটার কদর খুব বেশী চলছে।

সুজয় একটু উৎসাহিত হয়ে বলল—দেখুন গান আমি কিছু জানি। তবে কোনদিন গান কাউকে শেখায়নি।

বটুক বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনি তো সবই একটু একটু করে জানেন দেখছি। কিন্তু কাজের জানা তো একটিও জানেন না।

তারপর সুজয় একদিন বটুক বাবুকে গান শুনিয়েছিল। গান শুনে বটুক বাবু তো একেবারে অবাক। দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক। দিব্যি এমন গুনটাকে চেপে রেখেছেন।

সুজয় সলজ্জ হাসলো।

—যাক আপনার গানের ভাল টিউশুনি আমি যোগাড় করে দিতে পারবো। এতে ভাল পয়সা পাবেন।

সুজয় কয়েক মুহূর্ত কি জানি ভাবলো। তারপর বলল—বটুকবাবু, আপনি এখন আমার জন্য কিছু করবেন না।

বিস্ময়ে বটুকবাবু বললেন—কেন ?

—গানটা আমার শখের জিনিষ। এটা দিয়ে আমি অর্থ উপার্জন করতে চাইনা।

আর তাছাড়া চাকরির জন্য একবার চেষ্টা করে দেখি। তারপর যদি না পাই, তখন না হয় অন্য চেষ্টা করা যাবে।

—নাঃ আপনি দেখছি একেবারে আনপ্র্যাকটিক্যাল। এতটা ভাবপ্রবন হলে কি চলে মশাই। আজ কাল শুধু গিভ্ অ্যাণ্ড টেক পলিসি নিয়ে চলতে হবে। এতো কোন সঙ্কোচ রাখবেন না। নইলে একদিন দেখবেন, ঠিক আপনি ঠকে গেছেন।

সুজয় মৃদু হাসলো। তারপর বলল—নাঃ আপনি সত্যিই একজন পাকা সেলস্ ম্যান।

॥ ৯ ॥

আগামী সপ্তাহে মানসী কলকাতায় চলে যাবে। আবার কবে ফিরবে ঠিক নেই। মন্দ লাগেনি ওর গ্রামের পরিবেশ। বেশ কিছুদিন মনে থাকবে এই গ্রামের স্মৃতি। কিন্তু সেদিনকার ব্যাপারটার জন্য ওর মনটা ভয়ানক খারাপ লাগলো।

ভেবেছিল এর মধ্যে সুজয়ের সাথে একবার দেখা হবে। তাহলে সেই প্রসঙ্গ তুলে কয়েকটি কথা ওকে বেশ করে শুনিয়ে দেবে। যাতে এমন ভুল সুজয় আর কোনদিন না করে।

কিন্তু তারপর আর দেখা হয়নি। তাই সেই অপমানের জ্বালাটুকু এখনও মানসীর মনে মৃদুভাবে জ্বলছে।

বৈকালের দিকে মানসী ছাদে উঠল। এমনি সময় প্রায়ই ও ছাদে উঠে বেড়ায়। হাতে থাকে কলেজের বই। কিন্তু তা আর কোনদিনই খোলা হয়নি। প্রত্যেকদিন ভাবে আজকে কিছু পড়বে। এতদিন বেশ হৈ চৈ করে কাটালো। এবার ধীরে ধীরে মনটাকে টেনে নেবে পড়ার দিকে।

কিন্তু ছাদে উঠলে ওর মনটা যেন কোথায় মিলিয়ে যায়। সব কিছু ধরা বাঁধার বাইরে যে একটা জগৎ আছে, তা যেন মানসী নেবে এসে উপলব্ধি করে।

চারিদিকে সবুজ বন। অনন্ত নীল আকাশটা যেন কম উঁচু বোধ হয়। আর মাঝে মাঝে ঝাঁক বাধা বলাকার দল। কোথা থেকে তারা যেন উড়ে আসে। আবার কোথায় যেন মিলিয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে।

মানসী চেষ্টা করে সেই বলাকা গুলি গুনতে। একটা অপরিসীম আনন্দ পায় এই গোনার মধ্যে। তারপর মনটা যেন কেমন উন্মনা হয়ে পড়ে। বিরাট এক নৈঃশব্দের মধ্যে কিসের যেন একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে মনে।

মানসী অনুভব করে সেই প্রশ্নটা। মুখে তখন ওর মেঘের ছায়া। আর কালো হরিণ চোখ দুটিতে যেন নেমে আসে এক অসীম সমুদ্রের গভীরতা।

একদিন মানসী ঘরের জানালা থেকে তনুকে দেখতে পেলো।

তনু তখন ইস্কুল থেকে ফিরছিল। হাতে খান কয়েক বই। আর একটি ছোট লাঠি। লাঠিটি দিয়েও উড়ন্ত ফরিং গুলোকে মারছিল। আর মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ফড়িং গুলোর পেছনে ছুটছিল।

মানসী লক্ষ্য করল তনুর এই অবস্থাটা। ও হাত নেড়ে থামতে বলল তনুকে। প্রথম হাতছানি তনু দেখতে পেলো। আর বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে রইলো মানসীর দিকে। কারণ সেদিনের ঘটনাটা যে এখনও ওর মনে দাগ কেটে রয়েছে।

মানসী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো বাইরে। তনুও শক্ত করে লাঠি আর বইগুলো ধরলো। ভাবলো, ধরতে এসেই লম্বা ছুট দেবে জোরে।

মানসী কিছুটা দূর থেকে বলল—শোন, তোমার সাথে একটা কথা আছে।

তনু তবুও এক জায়গায় দাড়িয়ে রইলো। ও বিশ্বাস করতে পারল না মানসীকে।

মানসী এবার হেসে বলল—ভয় নেই। শোননা লক্ষীটি!

তনু যেন এবার অভয় পেলো। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মানসী লক্ষ্য করল, সেদিনকার ক্ষত স্থানে তনুর এখনও ব্যাণ্ডেজ লাগানো রয়েছে। তারপর এগিয়ে গিয়ে তনুর হাত ধরে বলল—আজকে এত তাড়াতাড়ি ইস্কুল ছুটি হলো কেন?

তনু অসঙ্কোচেই বলল—আমাদের বাংলা ক্লাস, আজকে হয়নি।

—কেন?

—আমাদের বাংলা পড়ান সুজয়দা। সুজয়দা ক'দিন হয়েছে ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেছে।

মুহূর্তেই মানসীর মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিলো। আর একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের মত মানসীর সমস্ত দেহ মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মানসী বলল—তোমার সুজয়দা কবে আসবে তনু?

—আমাকে তো বলে গেছে, সাত আট দিনের মধ্যে ফিরবে। কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে শুনলাম, এক মাসের ছুটি নিয়ে গেছে।

—কলকাতায় কেন গেছে জান?

—না। হঠাৎ চলে গেল। আমার সাথে তো দেখাই হতো না। ভাগ্যিস আমি সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তেঁতুল খাচ্ছিলাম।

মানসী এবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

তনু লক্ষ্য করল মানসীর এই ভাবান্তর। তাই বলল—আপনার বুঝি কোন দরকার ছিল সুজয়দার সাথে

প্রশ্ন শুনে মানসীর সম্বিৎ ফিরে এলো। তাই কথাটি এড়িয়ে যাবার জন্য বলল—আচ্ছা তনু, তোমার সুজয়দা বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসেন?

তনু এবার স্পষ্ট জবাব দিলো না।

মানসী জিজ্ঞাসা করল—কই বললে না তো?

মিষ্টি হেসে তনু বলে হ্যাঁ, সুজয়দা আমাকে ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। সুজয়দা বলে, আমি নাকি খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার হবো। এজন্য আমি রোজ গিয়ে সুজয়দার কাছে অঙ্ক শিখি।

মানসী এবার আদর করে তনুকে বলল—চলো আমার ঘরে। তোমাকে একটা সুন্দর জিনিষ দেখাবো।

তনু এবার নিরুচ্চার আপত্তি করে। তারপর বলল—আপনাদের সেই দারোয়ানটা কোথায় ?

মানসী হেসে বলে—ওকে সেদিন খুব বকেছি। আর তোমাকে কোনদিন কিছু বলবে না।

তনুর এবার দুষ্টু মনটা জেগে উঠল। বলল—আপনি মিথ্যে বলছেন। সেদিন সুজয়দা আমাকে ধরেছিল বলে, আপনি রাগ করে সুজয়দার সাথে কথা বলেছিলেন।

মানসী এবার অধরে কামড় দিয়ে চোখ দুটি বুজল। যেন ও সহ্য করতে পারছে না বালক তনুর এই কথাটা। পরক্ষণে চোখ মেলে মানসী বলল—আচ্ছা তনু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, দারোয়ানকে যে বকেছি ?

—না।

—আচ্ছা তোমার সামনে আবার বকে দিচ্ছি।

তনু কি মনে করে বলল—আর দরকার হবে না।

মানসী হেসে বলল—এই তো লক্ষ্মীছেলে।

ঘরে বসে তনু বলল—পায়ের ব্যথাটা এখনও সারেনি। এমন আচমকা ঢিলটা মেরে দিলো। নইলে ঠিক পালিয়ে যেতাম।

আজকে পায়ে ওষুধ লাগিয়েছ তো ?

—না।

মানসী ঘরের আলমারী খুলে কিছু তুলো আর ডেটল বার করল। তারপর সামান্য উষ্ণ গরম জল এনে বলল—গায়ের কোন জায়গা কেটে গেলে রোজ পরিষ্কার করতে হয়। নইলে টিটেনাশ, সেপটিক সব ভয়ঙ্কর রোগ হয়।

এই চেয়ারটায় বস। আমি নূতন একটা ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিই।

তনু আপত্তি করল না। সুবোধ বালকের মত চেয়ারের উপর বসল। আর মানসীও বেশ পটুহাতে ব্যাণ্ডেজটা লাগিয়ে দিলো।

ব্যাণ্ডেজটা লাগাবার পর মানসী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। ঠিক যেন কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের এক তৃপ্তির নিঃশ্বাসের মত।

ইতিমধ্যে একটি ভৃত্য মিষ্টির থালা হাতে ঘরে ঢুকল। মানসী তার হাতে থেকে থালাটি নিয়ে তনুর সামনে রাখলো।

তনু বিনা আপত্তিতে থালা থেকে কয়েকটি মিষ্টি তুলে নিল। খেতে খেতে বলল—তুমি খাবে না ?

—না, তোমার জন্য এনেছি। তুমি খাও।

তনু সব মিষ্টি খেতে পারল না। কিছু পড়ে রইল থালায়। তারপর মানসী বলল—চলো তনু বাগান থেকে ঘুরে আসি। তোমার যেমন ইচ্ছে, তুমি ফুল নেবে।

বাগানে গিয়ে তনু কিন্তু ফুলে হাত দিলো না। তাই মানসী নিজ-হাতেই কতকগুলি গোলাপ ফুল ছিড়ে দিলো তনুকে। তনু আনন্দে ফুল নিয়ে দৌড় দিলো বাড়ীর দিকে।

তনু চলে যাবার পর মানসীর মনটা যেন অনেকটা হাল্কা বোধ হলো। এ'কদিন যেন একটা পাথর চেপে বসেছিল ওর বুকে। আর আজ সেই পাথরটা যেন অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে মানসীর বুক থেকে সরে গেল।

* * *

মানসী চেষ্টা করেছিল সুজয়ের কলকাতার ঠিকানা সংগ্রহ করতে। তাই সেদিন রামহরিকে পাঠিয়েছিল হারুকে খবর দেবার জন্য।

খবর পেয়ে হারু তো একেবারে অবাক। তখন ভ্যাবলাও সঙ্গে ছিল। রামহরি চলে যাবার পর ভ্যাবলা জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার বলতো ? একেবারে তোকে ডেকে পাঠাল !

হারুর মুখ তখন পাংশুবর্ণ। কি বলবেও নিজেই বুঝতে পারলো না।

ভ্যাবলা ভরসা দিয়ে বলল —এতে ভয় পাবার কি আছে! তুই তো কিছু করিস নি।

—ভয়ের জন্য বলছি না। ভাবছি, কিসের জন্য ডেকে পাঠালো।

ইতিমধ্যে খাদু যেন কোথায় যাচ্ছিল। দূর থেকে ভ্যাবলা দেখতে পেয়ে চিৎকার দিয়ে বলল—এই খাদু শিগগীর শুনে যা। কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে।

খাদু প্রথমে ভ্রুক্ষেপ করল না। কারণ এমন ভাবে বিনা কারণে প্রায়ই ওরা ডাকে। কিন্তু কেলেঙ্কারী কথাটা খাদু আজ নূতন শুনল। তাই আর এড়াতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

সব শুনে খাদু মুখটিপে হেসে উঠল। তারপর ওষ্ঠ সামান্য ফাঁক করে বলল—আমি বুঝতে পেরেছি।

হারু সসব্যস্তে বলল—কিরে?

খাদু এবার মুখ বিকৃতি করে বলল—ন্যাকা চৈতন আমার। যেন কিছু বোঝে না।

হারু দন্ত বিকশিত করে বলল—সত্যি বলছিস? তাহলে এখুনি চল।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হারু নিজেই বাধ সাধলো। গায়ের জামাটার দিকে তাকিয়ে বলল—এ-জামাটা ভয়ানক ময়লা হয়ে গেছে। এটা বদলে একটা ধোয়া পাঞ্জাবী পড়ে আসি।

খাদু বলল—তাই যা। সেই ভাল হবে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে হারু ধোলাই করা ধুতি আর একটি পাঞ্জাবী পরে বেড়িয়ে এলো বাড়ী থেকে। আর খাদু একটি গাছ থেকে ফুল ছিড়ে এনে হারুর হাতে দিয়ে বলল—এটা রাখ। সুযোগ মত দিয়ে দিবি।

হারু সাগ্রহে ফুলটিকে নিল।

তারপর মানসীর বাড়ীর সামনে এসে হারু একটা অস্বস্তিতে বলল—দূর বুকটা যেন কেমন দপ্ দপ্ করছে। তোরাও সঙ্গে চল খাদু।

খাদু বলল—আরে বোকা এ কি সঙ্গে যাবার ব্যাপার। এসব একা একা করতে হয়। নইলে কাজ তাড়াতাড়ি এগোয় না।

শেষ পর্যন্ত ওরা দুজনে একটা বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইলো। আর হারু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মানসীদের গেটের দিকে।

গেটে তখন রামহরি দাঁড়িয়েছিল। হারুকে দেখে রামহরি সেলাম ঠুকে ঘরে নিয়ে বসালো। তারপর রামহরি নিজেই খবর দিতে গেল উপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মানসী এসে ঘরে ঢুকল। আর হারুকে এমন সাজ সজ্জায় দেখে একটু আশ্চর্য্য হলো।

হারু চেয়ার থেকে উঠে একগাল হেসে বলল—কি খবর মানসী-দেবী, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ, আপনি বসুন। কিছু কথার দরকার আছে।

মানসী একটি চেয়ারে বসে বলল—আচ্ছা সুজয়বাবু কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

প্রশ্নটি যেন একটা অদৃশ্য চাবুক লাগালো হারুর পিঠে। হারু ভাবতে পারেনি এমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য ওকে ডেকে পাঠাবে। আর এদিকে ও কি কল্পনা নিয়ে এসেছিল।

হারু কোনরকমে বলল—আজ্ঞে ও তো কলকাতায় চলে গেছে।

—কলকাতার ঠিকানাটা আপনি জানেন?

—ওর আবার ঠিকানা! ও কি আবার কাউকে ঠিকানা দিয়ে যায় নাকি। এই যে কলকাতায় গেছে, তা পর্যন্ত আমাদের জানায়নি।

মানসীর মুখটা এবার কিঞ্চিৎ ম্লান দেখালো। চেয়ার থেকে উঠে মানসী বলল— আপনি বসুন। আপনার চায়ের কথা বলে আসি।

—না, না। এখন চায়ের দরকার হবে না। আমাকে এখুনি একটা কাজে বেড়তে হবে।

মানসী আর দ্বিতীয় বার চা খাবার জন্য বলল না। আর বলবার মত মনের ইচ্ছে ওর ছিল না। অবশ্য আরেকবার বললে হারু হয়তো

অনুরোধটা এড়াতে পারত না। বরং কিছুটা সান্ত্বনা নিয়েই বাড়ী ফিরে যেতো।

রাস্তায় এসে হারু অন্য পথ ধরল। খাদু আর ভ্যাবলা তাই দেখে ভাবলো নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে। তাই অমন কোরে ওদের এড়িয়ে যেতে চাইছে।

খাদু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল—কিরে যেন চিনতে পারছিস না?

হারু এবার রাগ করে সজোরে ফুলটা ছুড়ে মারল খাদুর মুখের উপর। তারপর দাঁত খিচিয়ে বলল—আমি বুঝতে পেরেছি, হতভাগা কোথাকার।

*　　　*　　　*

কলকাতা যাবার দিন সকাল থেকে একটা থম্‌থমে ভাব। সুরেন-বাবু লক্ষ্য করলেন মেয়ের এই ভাবগতিক। পিসিমার ও নজর পড়ল ব্যাপারটা।

সুরেনবাবু বললেন—মানসীর শরীর বোধ হয় খারাপ করেছে?

পিসিমা স্বাভাবিক ভাবে বললেন—শরীর খারাপ হবে না, এই শীতের মধ্যে কাল রাত দশটা পর্যন্ত ছাদে ছিলো।

সুরেনবাবু শুনে খুব আশ্চর্য্য হলেন। এত রাত পর্যন্ত ছাদে থাকার কি কারণ থাকতে পারে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে মেয়ের ঘরের দিকে গেলেন।

মানসী তখন জানালায় দাঁড়িয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে গ্রামের পথের দিকে তাকিয়েছিল।

সুরেনবাবু কাছে এসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। মানসী চম্‌কে উঠে বলল—বাবা তুমি!

সস্নেহে তিনি বললেন—হ্যাঁরে, তোর শরীর খারাপ করেনি তো? নইলে আজকে যাওয়া বন্ধ থাক। আগামী কাল না হয় রওনা হওয়া যাবে।

মানসী জোর কোরে মুখে হাসি এনে বলল—না বাবা। আমার শরীর ভাল আছে। আজই কলকাতায় যাবো।

সুরেন বাবু শুধু চেয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। মেয়ের কথার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব ছিল, তা যেন তিনি সহজে বুঝতে পারলেন।

॥ ১০ ॥

দুপুরের দিকে সুজয় মেস থেকে বেড়লো। স্থির করেছে প্রথমে কাউনসিল হাউস স্ট্রীটের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ-এর অফিসে যাবে। সেখান থেকে কার্ড করিয়ে তারপর অন্য কোথাও যাবে। কারণ গ্রামে শুনেছে, ভাগ্যের জোরে ঐ কার্ডের মারফৎ অনেকের চাকরি হয়েছে।

ট্রাম থেকে নেমে এসে সুজয় কিছুটা পথ হেঁটে এলো। অফিসটা খুঁজে পেতে ওর বিশেষ অসুবিধা হলো না। কারণ লাইন দেখেই বুঝেছিল এটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অফিস।

এক লাইনের মধ্যে ইস্কুল ফাইন্যাল থেকে এম. এ. পর্যন্ত রয়েছে। চারি দিকে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব। গণ্ডগোলের মধ্যে কার কথা ঠিক শোনা যায় না। সুজয় তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু বেশীক্ষণ ও দাঁড়াতে পারল না। ভীড়ের ঠেলা-ঠেলিতে সুজয় বেড়িয়ে এলো লাইন থেকে।

এমনি সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ওর দিকে। পরনে তার আকর্ষণীয় জামা প্যাণ্ট। চোখে একটি মোটা ফ্রেমের চশমা। হাতে একটি সুন্দর চামড়ার ব্যাগ্। এক নজরে দেখেই মনে হবে, ইনি বিত্তশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একজন।

ভদ্রলোক চশমাটি খুলে বললেন—চাকরির চেষ্টায় বুঝি বেড়িয়েছেন?

সুজয় এক মুহূর্ত দেরী না কোরে বলল—হ্যাঁ। তা আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না?

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন—আমাকে চিনবেন না। আমি বেকারদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু।

সুজয় অত্যধিক বিস্মিত হয়ে বলল—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বেকারদের বন্ধু!

ভদ্রলোক আবার স্পষ্ঠ বললেন—হ্যাঁ, আমি বেকারদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। কারণ আমি এখান থেকে বহু ছেলের জীবনদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি।

কথাটি অত্যন্ত নাটকীয় লাগল সুজয়ের কাছে। তাই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক আবার বললেন—কিছু বুঝতে পারলেন না তো? তা আমি জানি। এর আগেও কেউ বুঝতে পারেনি। আর আপনি বা কেন পারবেন। চলুন এক কাপ চা খেতে খেতে সব কথা বলা যাবে।

ভদ্রলোক সুজয়কে আর কথা বলবার সুযোগ দিলেন না। একেবারে অনেকদিনের চেনা পরিজনের মত হাঁটতে শুরু করলেন। অগত্যা সুজয়ও আর কোন কথা না বলে ভদ্রলোককে অনুসরণ করল।

কিছুটা পথ হেঁটে গিয়ে ভদ্রলোক এক অভিজাত রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলেন। তারপর চায়ের সাথে এক প্রস্থ খাবারের অর্ডার দিলেন।

সুজয় এবার আপত্তি জানিয়ে বলল—এ সমস্ত আপনি কি করছেন?

ভদ্রলোক লঘু স্বরে বললেন—জানেন, কেউ যদি আমাকে ভালবেসে বিষ দেয়। তাও আমি বিনা দ্বিধায় পান করতে পারি। কারণ ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করি।

সুজয় আর কোন জবাব দিলো না। বয় এসে সমস্ত খাবার দিয়ে গেল। ভদ্রলোক খেতে খেতে বললেন—আপনার কোয়ালিফিকেশ্ন কি?

—বি. এ

—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ। আর আপনি এমনি ভাবে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার ওপর এমন স্মার্ট চেহারা। দাঁড়ান আমি কালই

আপনাকে পথ দেখাবো। হাউ টু আরন্ মাণি ইন দি ক্যালকাটা মার্কেট। এখানে প্রচুর অর্থ পড়ে আছে। শুধু ব্রেণটাকে অ্যাপ্লাই করে টাকা গুলো তুলে নিতে হবে।

এমন দৃঢ়তাপুর্ণ কথা শুনে সুজয়ের চিন্তাশক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হলো ও যেন এতদিন বাস্তব জগতের বাইরে ছিল।

উত্তেজনায় সুজয় বলল—আপনি আমায় পথ দেখান। আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার এই সহৃদয়তার জন্য।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—এখন আর বিশেষ কিছু বলবো না। আজ রাত আটটায় দশ নম্বর রাসেল ষ্ট্রীটের ভিক্টোরিয়া ক্লাবে আসুন। সেখানেই আমাদের কথা হবে। আর এই আমার ভিজিটিং কার্ড খানা রাখুন। এখানা দারোয়ানকে দেখালেই আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবে।

সুজয় উল্লাস সহকারে কার্ডখানি নিল। তারপর রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরবার সময় ভদ্রলোক বললেন—আপনার ভাল জামা প্যাণ্ট আছে তো?

সুজয় এবার একটু অসুবিধা বোধ করলো। বলল—আজ্ঞে এর চেয়ে ভাল জামা প্যাণ্ট তো নেই।

ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে বললেন—সেখানে তো স্মার্টলি যেতে হবে। নইলে একটু অসুবিধা হবে চলুন ভাড়া করা এক সেট স্যুট ব্যবস্থা করা যাক। তা পরেই আসবেন।

ভাড়া করা স্যুট নিয়ে সুজয় মেসে ফিরল। দীননাথ বাবুকে দেখে সুজয় হাসি মুখে বলল—আজকে এক বড় ব্যবসায়ী লোকের সাথে আলাপ হলো। আজ তিনি রাত আটটায় একটা চাকরির পাকা পাকি কথা দেবেন।

—তুমি ভাগ্যবান। তাই যোগাযোগটা খুব সহজে পেয়ে গেলে।

তারপর দীননাথ বাবু ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বললেন—কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক থেকো। আজকাল রাস্তাঘাটে বহু লোক ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের রূপ আর রুচিতে বিরাট ব্যবধান। আর

সময় মত সেই ব্যবধান বুঝতে না পারলে, একদিন দেখবে তাদের জালে তুমি জড়িয়ে পড়েছ। তখন তোমার মনে হবে, এটাই তোমার ন্যায় পথ। জীবনে অন্যায় বলে তখন তোমার যুক্তিতে কিছু থাকবে না।

সুজয় গম্ভীর ভাবে কথা গুলো উপলব্ধি করল। তারপর বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে জীবনে সততার উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আছে। আমি সে পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবো না।

নির্দিষ্ট সময়ে সুজয় হাজির হলো ভিক্টোরিয়া ক্লাবে। অতি আধুনিক গড়নে তৈরী ক্লাবটি। তাতে জমকালো মানানো রঙ্। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনেই উজ্জল আলোকে রাত্রিতে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়।

প্রাঙ্গনের শেষ প্রান্তে আলোর রোশনাই কম। সেখানে অন্ধকারের ভাগটাই বেশী। তাই শুধু মৃদু আলোকে সাজানো টেবিল চেয়ার গুলো অস্পষ্ট দেখা যায়। আর তার সাথে বিদেশী বাজনার অতি মন্থর পরশ।

সুজয় একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল এই পরিবেশে। যেন এই সঙ্কুচিত হয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এমন পরিবেশে ও যে কোনদিন আসেনি।

সুজয় এই নেশাগ্রস্থ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলো এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যবসায়ী প্রশান্ত বসাককে। তিনি তখন গোল টেবিলে বসে আরেক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছিলেন।

সুজয়কে দেখেই মিষ্টার বসাক অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন—হ্যালো মিষ্টার রায়। আপনি দেখছি কারেক্ট টাইমে এসে গেছেন। আসুন আপনার সাথে মিষ্টার সেনের আলাপ করিয়ে দিই।

বসাক তখন মিষ্টার সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী সুজয় রায়।

মিষ্টার সেন প্রসন্নচিত্তে হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

কিন্তু সুজয়ের কিঞ্চিৎ দেরী হল নমস্কার জানাতে। কারণ প্রথম পরিচয়টা যে এমন ধাপ্পাবাজীর মধ্যে দিয়ে হবে, তা সুজয় মোটেই ভাবতে পারেনি।

মিনিট কয়েক বাদে তাদের টেবিলে একটি মহিলা এলেন। পড়নে তার সিফনের শাড়ী। গায়ে হাত কাটা জামা। আর ভেতরের অন্তর্বাসটি সহজেই চোখে পড়ে।

বসাককে দেখে মহিলাটি উল্লাস সহকারে বললেন—হ্যালো মিষ্টার বসাক। অনেকদিন আপনাকে দেখতে পাইনি ?

বসাক এক বিশেষ ভঙ্গিমায় খুব সহজ ভাবেই বললেন—হ্যাঁ মিস্ চাটার্জী। আজই ইভিনিংয়ে দিল্লী থেকে ফিরেছি।

সুজয় আবার তাজ্জব হলো এই ডাহা মিথ্যে কথার জন্য।

বসাক এবার সুজয়ের দিকে চেয়ে, মিস চাটার্জীকে বললেন—ইনি আমার নূতন প্রাইভেট সেক্রেটারী। মিষ্টার রায়।

মিস্ চাটার্জী এবার নমস্কারের পরিবর্ত্তে করমর্দ্দনের জন্য হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ও মনের মধ্যে একটি মৃদু ধাক্কা খেলো।

সুজয়ের করমর্দ্দনের বিলম্ব দেখে মিষ্টার বসাক চকিতে এক চোখ টিপি দিলেন। সুজয় বুঝতে পারল বসাকের ইশারা। কিন্তু তবুও কয়েক মুহূর্ত দেরী কোরে সুজয় ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলো মিস্ চাটার্জীর দিকে।

বসাক এবার সুজয়কে বললেন—আপনি মিস্ চাটার্জীর সাথে একটু কথা বলুন। আমি মিষ্টার সেনের সাথে কতগুলি জরুরী কথা বলে আসি।

সুজয় মনে মনে শঙ্কিত হলো। কারণ প্রাথমিক আলাপে ও যে পরিচয় পেলো। তাতে আরো কিছুক্ষণ আলাপ হলে, আরোও বেশী কিছু ঘটবে বলে ওর মনে হলো।

বসাক মিষ্টার সেনকে নিয়ে সেই অন্ধকারের দিকটায় গেলেন।

ওদিকটায় তখনও নিরালা। শুধু জন কয়েক লোক বসে আছে চেয়ারে।

ইতিমধ্যে মিস্ চাটার্জী সুজয়ের টেবিলে বসলো। সুজয় একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কারণ এমন উগ্র বেশ-বিন্যাশের সম্মুখীন সুজয় আজ প্রথম হলো। আর এতে যদি চোখ অভ্যস্থ না থাকে, তাহলে আপনা থেকেই যে দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়ে।

মিস্ চাটার্জী বললেন—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ভয়ানক লাজুক।

সুজয় অস্বস্তি বোধ করলো এমন সত্য কথায়। তাই সুজয়ও সত্য বলল—লাজুক তো আপনিই করে দিয়েছেন।

—বাঃ আপনি তো বেশ সুন্দর কথা বলেন!

সুজয় মৃদু হাসলো।

মিস্ চাটার্জী এবার নিঃসঙ্কোচে সুজয়ের হাতটি ধরলো। লজ্জায় সুজয়ের সমস্ত শরীরটা ঘেমে উঠল। কিন্তু তবুও ভদ্রতার খাতিরে হাতটি সুজয় মিস্ চাটার্জীর হাতের মুঠিতেই রাখলো।

মিস্ চাটার্জী হাত ধরা অবস্থায় বললেন—জানেন কলকাতার শীতটা আমার মোটেই গায়ে লাগে না। তাই শীত আর গ্রীষ্মের পোষাকটা আমার এক হয়ে গেছে।

সুজয় মিস্ চাটার্জীর হাতের স্পর্শ আরো গভীরভাবে অনুভব করলো। আর তার চোখের কাল মণি দুটো যেন বার কয়েক দেহ ধর্মের ইশারায় নেচে উঠল।

সুজয় বুঝতে পারল অবস্থা কোন দিকে চলেছে, তাই সলজ্জভাবে বলল—মিস্ চাটার্জী আজকে আপনার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারছিনা। তার জন্য আমি খুব দুঃখিত।

—সে কি, মিষ্টার বসাক যে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। না, আপনি দেখছি ভয়ানক বিজি। একটু বসুন।

অন্তত একসাথে সামান্য ড্রিঙ্ক করে যান। নইলে সত্যি আমি ভয়ানক রাগ করবো।

সুজয় আর সৌজন্যতা বজায় রাখতে পারল না। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে এক ঝটকায় হাতটি ছাড়িয়ে নিলো। ইতিমধ্যে বসাক এসে উপস্থিত হলেন। অতিরিক্ত নেশার টানে তার দেহ তখন বার কয়েক দুলে উঠলো।

মিস্ চাটার্জী তাকে দেখে বললেন—আপনার সেক্রেটারী দেখছি, একেবারে কার্টসি জানে না।

কিন্তু সুজয় আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না। বসাককে আগামী কাল দেখা করবে বলে, সদর্পে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

পরের দিন সেই নির্দিষ্ট সময়ে সুজয় ভিক্টোরিয়া ক্লাবে গেল। পড়নে ছিল ওর সাধারণ ধুতি আর পাঞ্জাবী। আর হাতে ছিল ভাড়া করা স্যুটটা।

খবর পেয়ে মিষ্টার বসাক সহাস্যে বেড়িয়ে এলেন। সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—কালকে রাগ করে আপনার চলে যাওয়া উচিত হয়নি; আজকাল কি এত প্রিন্সিপ্ল নিয়ে চলা যায় মশাই। প্রয়োজনে সেই প্রিন্সিপ্লের উপর কাঁচি চালাতে হয়।

সুজয় মুখ গম্ভীর কোরে বলল—মিষ্টার বসাক, আমি আপনার কাছে এখন কোন চাকরির আশা নিয়ে আসিনি। আর আগে আপনার পুর্ণ পরিচয় পেলে, আমি কখনও আপনার চাকরীর প্রার্থী হতাম না।

—ফের মশাই প্রিন্সিপ্লের কথা বলছেন। নিজে বুঝতে পারছেন না, এই দেশটা কিসের উপর চলছে। স্রেফ্ একটা ফলস্ সারকেল্-এর মধ্যে। সুতরাং এর মধ্যে আপনিই বা কেন হোলি পয়েন্ট হয়ে থাকবেন। একদিন দেখবেন এই ফলস্ সার্কল-এর গতিতে আপনিও ভেসে গেছেন।

সুজয় দৃঢ় চিত্তে বলল—যদি সেই সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাহলে হোলি পয়েন্ট স্ব-ইচ্ছায় আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে।

কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই। অনুগ্রহ কোরে এমন মোহময় যুক্তিতে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। জীবনের সত্য পথের শুভ আদর্শের প্রতি বিচার করে, নিজের কর্তব্যটুকু পালন করুন। এতে শান্তি ও স্বস্তি দুই পাবেন।

তারপর সুজয় আর দাড়ায়নি। গত কালের ভাড়া করা স্যুটটা মিষ্টার বসাকের হাতে দিয়ে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিদায় নিল সেখান থেকে।

আর মিষ্টার বসাককে দেখে মনে হলো তিনি যেন ফল্‌স্ সার্কল্‌-এ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় হোলি পয়েন্ট এসে কয়েক মূহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছেন।

॥ ১১ ॥

মিস্ চাটার্জী স্তম্ভিত হয়েছিলেন সুজয়ের আচরণে। কারণ ভিক্টোরিয়া ক্লাবে নৈশ জীবনের অভিজ্ঞতায় আজ এই প্রথম তিনি প্রত্যাখিত হলেন।

এতদিন তিনি ছিলেন অপরাজয়ী রূপসী। তাই তার গর্বের সীমা ছিল না। উদ্ধত দেহ আর যৌবন নিয়ে তিনি চলাফেরা করেছেন সর্বত্র। আর তার বিনিময়ে তিনি এনেছেন নিজের বিপুল ঐশ্বর্য্য। এখন অর্থ তার ঘরের দরজায়। অর্থ তার পিছু পিছু।

কিন্তু আজ?

এই জিজ্ঞাসাটাই যেন এক চরম আঘাত দিল মিস্ চাটার্জীর মনে। কোন প্রয়োজন ছিল না এই আঘাতকে অনুভব করার। কিন্তু এই আঘাত যে গ্রহণ করেছে, মিস্ চাটার্জীর অন্তর প্রকৃতি।

সেখানে যে তার বহিঃ প্রকৃতির কোন প্রবেশ নেই। তাই সুজয়ের নির্মল স্বাক্ষরে মিস্ চাটার্জী সম্পূর্ণ লজ্জিতা, অপমানিতা। আর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় মিস্ চাটার্জী যেন ফিরে গেলেন তার অতীত জীবনে।

বহুকাল তিনি সেই জীবনকে ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ ভুলে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। এতদিন তিনি ছিলেন পাকের আবর্তে। যেখানে শুধু ছিল ভোগ আর লালসার কদর্য্য খেলা।

কোন পথ ছিল না, সেখান থেকে ফিরে তাকাবার। একটা আদিম রিপুর জাল যে তাকে ঘিরে ধরেছিল নির্মমভাবে।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তিনি অবসর পেয়েছেন। এ অবসর অবসাদের নয়। অথবা ক্লান্তিকর জীবনেরও নয়। এ অবসর শুধু পেছনে ফেলে আসা দিনগুলি ভাববার কথা।

তখন মিস্ চাটার্জীর নাম ছিল সীমা চাটার্জী। বয়স তখন তার পনেরো। স্কুলে পড়েন। সুশ্রী দেহ গঠন। রং ফর্সা। আর মাথায় ঘন কালো কেশ।

সীমা চাটার্জীর বাবাও তখন জীবিত ছিলেন। তিনি করতেন যজমানী। খুব শুদ্ধ মানুষ ছিলেন। জীবনে কোনদিনই তিনি প্রতারনা করেন নি। আর অন্যায় কখনও প্রশয় দেননি।

সর্বদাই পূজা আহ্নিক নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। আর এতেই চালাতেন তার সংসার।

কিন্তু এই জীবিকায় যেন ভাঁটা পড়ল। তাই বছর খানেকের মধ্যে তার ঘরের প্রদীপ তখন নিবু নিবু। অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি প্রদীপ খানি জ্বালিয়ে রাখতে। তাই একদিন কাজ নিলেন মুদিখানার দোকানে।

সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। মাঝে শুধু ঘণ্টা তিনেকের ছুটি। ওর মধ্যে তাকে সারতে হতো খাওয়া, স্নান আর বাড়ীর যাবতীয় কাজ। তাই বিশ্রমের কোন অবসর ছিল না সারা দিনের মধ্যে।

এই দীর্ঘ পরিশ্রমে তিনি বেতন পেতেন মাত্র চল্লিশ টাকা। আর ঘরভাড়া দিতেন কুড়িটাকা। তাই মুদিখানার মালিক বলতো—

অত টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকবার কি দরকার মশাই। আরও কম টাকায় অন্য কোথাও ঘর দেখে নিন।

এ কথার জবাব তিনি কি দেবেন।

রুচি যে তার অনেক বড়। সুস্থ সুন্দর মানুষের মত তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। আর তার সাথে মেয়েকেও তিনি অনুরূপ বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাইতো কম টাকায় বস্তী পাড়ায় তিনি যেতে পারেননি।

সেখানে টাকার অঙ্ক সত্যি কম। কিন্তু মনের খোরাক একেবারে শূন্য। তাই কিছু শিক্ষা, সংস্কার আর সভ্যতা বোধ নিয়ে থাকা সেখানে একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু মুদিখানার মালিক তা বোঝেনি। ভেবেছিলেন মুদিখানার যে কর্ম্মচারী, তার আবার মনের খোরাক কিসের। তাই তিনি অত সহজভাবে সেকথা বলতে পেরেছিলেন।

প্রতিদিন তিনি দোকান থেকে ফিরতেন প্রায় রাত নটা'য়। সীমা চাটার্জী তখন হারিকেনের আলোয় বসে বই পড়তেন।

একটি ঘর, তাতে দু'টি জানালা। জানালা দু'টি সব সময় খোলা থাকতো। কিন্তু দরজাটি সব সময় বন্ধ রাখতেন সীমা চাটার্জী। নইলে তার গা'টা যেন কেমন ছম ছম করতো। আর সব সময় মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক। কেউ বুঝি অতর্কিতে ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু চুরি করার যে কিছুই ছিল না। কোন জিনিষ পত্র বোঝাই করা ট্রাঙ্ক। অথবা তার গায়ের সোনার অলঙ্কার।

শুধু ছিল বাবার খান কয়েক ধুতি। তাও আবার যজমানীতে পাওয়া অল্প টাকার। আর ছিল সীমা চাটার্জীর সামান্য কয়েকটি শাড়ী আর কাঁচের চুড়ি।

কিন্তু সীমা চাটার্জী একটি জিনিষ বুঝেছিলেন। তা ছিল তার মনের নিরাপত্তা বোধ। কতকটা আশ্চর্য্য হবারই কথা, কারণ এমন অল্প বয়সে এই চিন্তাটা যে আসা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

কিন্তু তবুও এসেছিল। কারণ পরিবেশই সীমা চাটার্জীকে বুঝতে সাহার্য করেছিল। ছোট থেকে সে ঘরে একলা। তাই ছোট বয়সেই তাকে ঘরের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

বাবার অনুপস্থিতে তাকে যেতে হতো ঘরের বাইরে। দোকানে অথবা বাজারে। সেখানে দেখতো তাকে অনেক অচেনা মুখ। তখন সে অনেক ছোট। তাই অচেনা মুখ গুলির কাছে সীমা চাটার্জী অচেনাই থেকে গিয়েছিল।

কিন্তু কয়েক বছর ঘুরতেই, অচেনা মুখগুলি তাকে চেনা করে নিল।

সীমা চাটার্জী দেখতো তাদের দৃষ্টি। কেউ চোরা দৃষ্টিতে তাকাতো। কেউ বা নিলর্জের মত দেখতো। ভয়ানক তিনি তখন লজ্জা পেতেন। কিন্তু তবুও তাকে এই লজ্জার ঘাটে যেতে হতো প্রায় দিনই।

ইস্কুলের পথেও ছিল অনুরুপ অবস্থা। কিন্তু এতে সীমা চাটার্জী ভয় পেতেন না। কারণ ঐ অশ্লীল দৃষ্টি শুধু ইঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবশেষে একদিন এই বিশ্বাসের ভুল ভাঙ্গল। যেদিন তার বাবা সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এসেছিলেন।

শরীরটা তার সেদিন ভয়ানক অসুস্থ ছিল। তাই রাত্রিতে তিনি ভাত খাবেন না। পাউরুটি আনার জন্য তিনি মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন দোকানে। আর দোকান থেকে ফিরবার মুখেই ঘটলো সেই অঘটনটা।

একটা বেদনাময় আর লজ্জাকর অবস্থা। আজও সেই অশ্লীল দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে সীমা চাটার্জীর মাথাটা যেন ঘুরে যায়।

ঘুরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ সেদিনই তো প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন পুরুষের সেই প্রবৃত্তিটা! কি অমানুষিক! যেন অক্টোপাশের মত তাকে জড়িয়ে ধরেছিল একটা গলির অন্ধকারে। নিস্পিষ্ঠ বাহুর চাপে কণ্ঠ তার রোধ হয়ে এসেছিল। আর একটা ভীষণ ভয়ে জিভ তার শুকিয়ে গিয়েছিল।

অসহায় জীবের মত তিনি তখন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। বৃথা চেষ্টা। তারপরই নিরুপায় হয়ে এক চরম কামড় বসিয়ে দিয়েছিলেন লোকটির হাতে।

এতেই কাজ হয়েছিল। লোকটি একটি অস্ফুট আর্তনাদ করে তাকে ছেড়ে দিল। আর সেই মুহূর্তে সীমা চাটার্জী দৌড় দিয়েছিলেন ঊর্ধশ্বাসে।

এক দৌড়েই তিনি পৌঁছেছিলেন ঘরের দরজায়। হৃদপিণ্ডটা তখন তার অস্বাভাবিক ভাবে চলছিল। পা দুটোও কেমন থর থর করে কাঁপছিল। তাই ঘরের বাইরে কয়েক মিনিটের জন্য তিনি নিষ্প্রাণ হয়ে বসে পরেছিলেন।

সীমা চাটার্জী চিনতে পেরেছিলেন লোকটিকে। লোকটি যে তাদেরই পাড়ার এক মধ্যেবয়স্ক ব্যক্তি। তাকে পাড়ায় অনেকেই চেনে। অনেকে তাকে কাকু বলে ডাকে। তাই সীমা চাটার্জীও তাকে কাকু বলে ডেকেছিলেন।

কিন্তু আজ কি পরিচয় পেলো কাকুর। তাই লজ্জায় আর ঘৃণায় সেদিন তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে বাবার কাশির শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এত দেরী হলো কেনরে ?

কি উত্তর দেবেন! তাই কয়েক মুহূর্ত দেরী হয়েছিল। বলেছিলেন—অন্য দোকান থেকে আনতে হয়েছে বাবা।

তারপর থেকে তিনি আর রাত্রিতে রাস্তায় বের হতেন না। সব কাজই দিনের বেলায় সেরে রাখতেন। আর একলা ঘরেতে খিল এটে বসে থাকতেন।

এইভাবে দিন কাটছিল। তারপর একদিন এই ছোট সংসার থেকে বিদায় নিলেন তার বাবা। তখন সীমা চাটার্জী ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। কয়েকটি বাড়ীতে টিউশুনি করেন। কিছুটা স্বচ্ছল অবস্থা।

বুদ্ধি আর বিবেচনায় লোক তিনি তখন অনেক চিনতে শিখেছিলেন। তাই অনেক ভদ্রলোকের গোপন পরিচয় তার অজানা ছিল না।

এমনি দিনে সীমা চাটার্জীর আলাপ হলো মিসেস মজুমদারের সাথে। তিনি তখন নূতন এসেছিলেন পাড়ায়। একটা দোতলা বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন।

দেখতে তাকে বেশ সুশ্রী ছিল। সব সময় দামী দামী শাড়ী পরতেন। আর ঠোটে লিপষ্টিক মাখতেন। চুল গুলিও ছিল আধুনিক ধরণের। আর গায়ে ছিল সর্ব্বদা এক সুগন্ধি।

সীমা চাটার্জীর ভাল লেগেছিল তাকে। কারণ কথায় আর ব্যবহারে মিসেস্ মজুমদার ছিল সম্পুর্ণ অন্য ধরণের।

তাই যেদিন প্রথম সীমা চাটার্জী তাকে মাসিমা বলে ডেকেছিলেন—সেদিনই মিসেস্ মজুমদার আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—প্লিজ আমাকে মাসিমা বলে ডেকো না। ওটা বড় ভালগার। আমাকে তুমি মিসেস্ মজুমদার বলেই ডাকবে। এতেই আমি খুশী হবো।

সীমা চাটার্জী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ এমন একজন বয়স্কা মহিলার নিকট তিনি যে একথা শুনবেন ; তা তিনি আশা করতে পারেন নি।

তারপর নীচে গাড়ীর হর্ণের শব্দ হলো। বোধ হয় বার দুয়েক হয়েছিল।

মিসেস্ মজুমদার ব্যস্ত হয়ে বললেন—মাঝে মাঝে এসো ভাই। আমি খুব খুশী হবো।

সীমা চাটার্জী লজ্জা পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে নীচে মিঃ মজুমদার এসেছেন। তাই তাড়াতাড়ি তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

আসবার মুখে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মিঃ মজুমদারকে। সুদর্শনই মনে হলো। দামী স্যুট পরা। গলায় টাই লাগানো। আর হাতে একটি কাগজে মোড়া যেন ওষুধের বোতল মনে হলো।

বাড়ী ফিরে সীমা চাটার্জী মিসেস্ মজুমদারের কথা ভেবেছিলেন। সত্যি যেমন রূপ, তেমন ভাগ্য। দুই দিক থেকে বেশ মিলেছে। ভগবান যেন ওদের দু'হাত ভরে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

অর্থও তাদের প্রচুর। নইলে দু'জনের জন্য অতবড় বাড়ী ভাড়া নেয়। বড়লোক বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! মিসেস্ মজুমদারের এখনও একটি ছেলেমেয়ে হয় নি। অথচ তাকে দেখে মনে হলো, বিয়ে হয়েছে তাদের বছর আটের ও বেশী।

তারপর ও সীমা চাটার্জী তার বাড়ী গিয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ মজুমদারকে আর দেখতে পাননি। তাই তার মনে হয়েছিল, তিনি বোধহয় এখন কলকাতার বাইরে।

কিন্তু অপর একজনকে দেখেছিলেন মিসেস্ মজুমদারের ঘরে। বোধহয় কোন আত্মীয় হবে। বেশ সপ্রতিভ দেখতে। তার দু'একটা কথা সীমা চাটার্জীর কানে ভেসে এসেছিল। মনে হয়েছিল লোকটি যেন ভাল বাংলা জানে না। কেমন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট উচ্চারণ। তাই সীমা চাটার্জী একদিন মিসেস্ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আচ্ছা মিসেস্ মজুমদার ভদ্রলোক কি ভাল বাংলা জানেন না?

মিসেস্ মজুমদার মৃদু হেসে বলেছিলেন— না, উনি মাদ্রাজী।

* * *

তারপর সীমা চাটার্জীর মনে সন্দেহের কাঁটাটা জেগে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সহজে বিশ্বাস করার মত কথা নয়।

কত স্বাভাবিক মিসেস্ মজুমদার। কথায় আর ব্যবহারে তেমন কিছু স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু মনে হতো, তিনি একটু বেশী বিলাসিনী। আর কথায় যেন প্রগলভতার ভাবটি বেশী।

একদিন সীমা চাটার্জীর সেই দ্বিধা জড়িত মনটা সম্পুর্ণ মুক্ত হলো। যেদিন দেখেছিলেন সেই পাড়ার কাকু মিসেস্ মজুমদারের ঘরে। দিব্যি তিনি তখন ঘরের সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আর পাশে মিসেস্ মজুমদার বিবসনা হয়ে বসেছিলেন।

দৃশ্য দেখে সীমা চাটার্জীর বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ঠিক সেদিনের রাত্রির মত। তাই সেদিন মিসেস্ মজুমদারের সাথে দেখা না করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়ী ফিরেও সীমা চাটার্জীর মনটা সুস্থির হয় নি। ঘুরে ফিরে কেবল মিসেস্ মজুমদারের কথাই মনে পড়েছিল।

তাহলে বাড়ী, গাড়ী, মিষ্টার মজুমদার সব মিথ্যে। আশ্চর্য মিসেস মজুমদার। কোন সঙ্কোচ নেই চাল চালনে। তাই লজ্জায় আর ভয়ে সীমা চাটার্জী ক'দিন আর মিসেস মজুমদারের বাসায় গেলেন না।

কিন্তু মনে মনে এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন তিনি। তাই বিনম্র মনটা আবার কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল সেখানে যাবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত আবার তিনি গেলেন কতকটা হাল্কা মন নিয়ে। মিসেস মজুমদার তখন প্রসাধনে ব্যস্ত। তাই দেখে সীমা চাটার্জী বলেছিলেন— আচ্ছা, আপনি একলা রোজ রোজ বেড়াতে যান। কই, আমাকে তো একদিন যেতে বলেন না।

মিসেস মজুমদার স্বাভাবিক ভাবে বলেছিলেন—তোমার তো ভাই সেখানে ভাল লাগবে না। আমি নানা কাজে বের হই।

সীমা চাটার্জী প্রত্যয়ের সুরে বলেছিলেন—না, আমার ভাল লাগবে। আমাকে একদিন নিয়ে চলুন।

মিসেস মজুমদার তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। যেন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন সীমা চাটার্জীর ইঙ্গিতটা। তবুও তার কথার সাথে আর দৃষ্টির অভিব্যক্তি কতটা ফুটে উঠেছে, তা যেন মিসেস্ মজুমদার বুঝতে চেয়েছিলেন।

পরদিন তিনি রাজী হলেন সীমা চাটার্জীকে নিয়ে যাবার জন্য। তাই সেদিনের সন্ধ্যায় সীমা চাটার্জী এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মিসেস মজুমদারের ফ্ল্যাটে।

খুব স্বাভাবিক ছিল তার সাজ পোষাক। তাই মিসেস্ মজুমদারের পছন্দ হলো না।

নিজের আলমারি খুলে কিছু অলঙ্কার আর একটি দামী শাড়ী বার করে দিয়েছিলেন তাকে।

সীমা চাটার্জী মৃদু আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তা তেমন জোরাল নয়। তারপর মিসেস্ মজুমদারই নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন তাকে। তারপর একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সীমা চাটার্জী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে দিন তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন; তিনিও কম সুন্দর নয়। তাই এক অনির্বচনীয় আনন্দে মনটা তার নেচে উঠেছিল।

ঘর থেকে বেড়িয়ে দু'জনে একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সীমা চাটার্জী প্রশ্ন করেছিলেন—এখানে দাঁড়ালেন যে? বাস ষ্ট্রাণ্ড তো আরো এগিয়ে।

কিন্তু তার কথার জবাব দেবার আগেই তাদের সামনে একটি ট্যাক্সি এসে থামল। মিসেস্ মজুমদার খুব স্বাভাবিক ভাবে তার দরজাটি খুলে ভিতরে গিয়ে বসলেন। আর সীমা চাটার্জীও এক জড়তা ভাব নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসেছিলেন।

সীমা চাটার্জীর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ট্যাক্সিটা কিভাবে এলো। মিসেস্ মজুমদার তো ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকেনি। অথচ ট্যাক্সিওয়ালা না ডাকা সত্বেও ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

প্রায় মিনিট কুড়ি পর সীমা চাটার্জী একটি মৃদু ধাক্কা খেলেন। বুঝতে পেরেছিলেন গাড়ীটি তাদের গন্তব্যস্থলে এসে থেমেছে।

মিসেস্ মজুমদার গাড়ী থেকে নামলেন। সঙ্গে সীমা চাটার্জীও। গাড়ীটি তার প্রাপ্য ভাড়া নিয়ে চলে গেল। তারপর মিসেস্ মজুমদার ভিক্টোরিয়া ক্লাবে ঢুকলেন।

আলাপ হয়েছিল অনেক লোকের সাথে। মিসেস্ মজুমদারই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের সাথে। তারপর দেখা হলো

মিসেস্ মজুমদারের স্বামী বলে।

আলাপ হবার সময় সীমা চাটার্জী জানতে পেরেছিলেন, তার নাম প্রশান্ত বসাক।

সেদিন থেকে সীমা চাটার্জীর নামটা হারিয়ে গেল। শুধু রইলো মিস্ চাটার্জী।

মিসেস্ মজুমদার বলেছিলেন—সে যেন মিস্ কথাটাই ব্যবহার করে। কারণ এখানে নামের চেয়ে, নামের বিশেষনটাই সকলে বেশী পছন্দ করে।

তারপর কয়েকটি বছর কেটে গেছে। মিসেস্ মজুমদার তখন হারিয়ে গেছেন অন্য জগতে। এখন শুধু মিস্ চাটার্জী একা।

তিনি এখন মিসেস মজুমদারের অভাবটা পুরোপুরি মেটান। আর তার সাথে বুঝেছেন, রূপ আর দেহ যেন পুরুষের চোখে এক অনির্বাণ অগ্নি শিখা। কি প্রবল তার আকর্ষণ। কোন পুরুষের ব্যক্তিত্ব যেন স্থির থাকতে পারে না তার কাছে। আর এটাই যেন তিনি নিজেকে দিয়ে খুব ভাল ভাবে যাচাই করে দেখেছেন এই ভিক্টোরিয়া ক্লাব।

কিন্তু আজকে মিস চাটার্জীর জীবনের চরম সত্যটা অন্য বাঁক নিয়ে দাঁড়ালো। আর তার সাথে এক নিদারুণ লজ্জা আর ঘৃণায় তার জীবনের বোধশক্তিটা যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

মিস চাটার্জী সহ্য করতে পারলেন না এই মানসিক অবস্থাটা। তাই কিছু স্বস্তির আশায় তিনি বেরিয়ে এলেন ক্লাব থেকে। তারপর কোন গাড়ীতে না উঠে দীর্ঘপথ হেটে বাড়ী ফিরে এলেন।

॥ ১২ ॥

একদিন। দু'দিন। তিনদিন পার হলো। সীমা চাটার্জী আর ক্লাবে গেলেন না। মন তার অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। বিবেকের যন্ত্রনাটাও ক্রমশঃ উপশমের দিকে। এই ক'দিনেই সীমা চাটার্জী অনুভব করেছেন—এই সুস্থ জীবনটা কত সুন্দর, কত উজ্জ্বল।

কিন্তু চতুর্থ দিনে প্রশান্ত বসাক এসে উপস্থিত হলেন সীমা চাটার্জীর ফ্ল্যাটে। সাধারণতঃ তিনি খুব কমই আসেন। কারণ ইচ্ছে থাকলেও যেখানে সেখানে তিনি যেতে পারেন না। তাই সব সময় সতর্ক হয়ে তাকে পথ চলতে হয়। আর সেই চলার পথে নিত্য নূতন তাকে বেশ ধরতে হয়। নইলে সেই অসতর্ক মুহূর্তে তাকে ধরা দিতে হবে পুলিশের হাতে।

প্রশান্ত বসাক আমদানী রপ্তানির ব্যবসায়ী বটে। তবে তা দিনের বেলায় সূর্য্য লোকের মধ্যে হয় না। অন্ধকারের গুপ্ত পথে। অথবা কোন বড় রেঁস্তরার ঘরে। যেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ।

কথা হয় তাদের আকার ইঙ্গিতে। বিস্ময়কর সেই কথাবার্তা। কোন লোক দেখলে একটি ইঙ্গিতও বুঝতে পারবে না। বরং দেখে তার মনে হবে একটা মুখাভিনয়ের পালার একটি অংশ সে দেখল। আর তার সাথে তাদের কাজও মিটল।

তবুও ক'বার প্রশান্ত বসাক পুলিশের নজরে পড়েছেন। আর ভাগ্যের জোরে রেহাই পেয়েছেন প্রত্যেকবার। তবুও তিনি অন্ধকারের ব্যবসা ছাড়তে পারেননি। তাই আজও তিনি অন্ধকারের গলিপথে চোরাই মালের চালান দেন।

কিন্তু এই ব্যবসা তিনি ছাড়বেন কি কোরে। তার পেছনে যে

বিরাট দল গড়ে উঠেছে। আর এই দলকে যে তিনি নিজের হাতে তৈরী করেছেন।

নানা জায়গা থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন দলের ছেলেদের। তারপর তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা স্থানে।

কোন জায়গার কোন পথটা সহজ। কোন জাহাজটা ডকে ভিড়লে কার সাহার্য নিতে হবে। কোন লোকের কাছে গেলে মালটা সহজে বিক্রি করা যাবে। এ সমস্ত কাজগুলি মিষ্টার বসাক তার দলের লোকদের নিপুন ভাবে শিখিয়েছেন।

তারপর আছে কথার ভঙ্গী। কথার ছন্দ আর আবেগে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কৌশল। আর এই কৌশলেই মিষ্টার বসাক ছেলে সংগ্রহ করেছেন সবচেয়ে বেশী।

মিষ্টার বসাকের ছেলেধরার স্থান নির্বাচনও অপুর্ব্ব। কোন এমপ্লয়মেণ্ট অফিসের দরজায়। অথবা পার্কে বসে থাকা কোন হতাশ যুবককে।

তিনি তখন অমন ছেলের মানসিক অবস্থাটা বোঝেন। তাই কথায় কিছুটা সহানুভূতি আর হৃদ্যতার মধ্যে দিয়ে তাকে কাছে টেনে নেন। তারপর শুরু করেন তার কথার যাদু। সেই কথার মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝে নেন ছেলেটির চেতনা বোধ। যাতে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত তার সাথে হাত মিলাবে কিনা।

যদি কথায় না কাজ হয়। তাকে নিয়ে যাবে ক্লাবে। তারপর তাকে ডুবিয়ে দেবে মদ আর লালসায়।

সে এক বিচিত্র অবস্থা। আদিম প্রবৃত্তিটা তখন জেগে উঠে পাশবিক ভাবে। নিত্য নূতন ভাবে দেখা দেয় তার যৌন বিকার। মনের শুভ চেতনা তখন মুছে যায়। অন্তরের দৃষ্টিতে তার ছানি পড়ে। আর মানুষের আকৃতি নিয়ে বাঁচবার দাবী তার তখন অন্যরূপে।

এই পথেই এতদিন সার্থক হয়ে এসেছেন মিষ্টার বসাক। কিন্তু

হেরে গেছেন সেদিন। যেদিন সুঞ্জয় অতি নির্ম্মম ভাবে তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে চলে গেছে সীমানার বাইরে।

*　　　　*　　　　*

সীমা চাটার্জী ঘরেই ছিলেন। পরনে তার এক অতি সাধরণ শাড়ী। চোখের দৃষ্টিতে এক উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা। পরিচিত কেউ দেখলে হয়ত এক পলকে তাকে চিনতে পারবে না।

পর্দা ঠেলে মিষ্টার বসাক ঘরে ঢুকলেন। সীমা চাটার্জী তাকে দেখে যেন ভূত দেখার মত আত্‌কে উঠলেন।

মিষ্টার বসাক কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে বললেন—খুব ভয় পেয়েছো মনে হলো। আর একি তোমার বেশ মিস চাটার্জী?

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন সীমা চাটার্জী। কি জবাব দেবেন তা তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করতে পারলেন না।

মিষ্টার বসাক তার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে একটা কোচের উপর গিয়ে বসলেন। তারপর হাই তুলে যৌন অনুভূতির এক শিথিল আবেশকে ছড়িয়ে দিলেন।

সীমা চাটার্জী বুঝতে পারলেন কিসের জন্য তিনি এসেছেন! তাই নিজেকে তৈরী কোরে বললেন—আপনি ফিরে যান মিষ্টার বসাক।

বসাক তখন সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করছিলেন। আর এই কথা শোনা মাত্র তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

মৃদু স্বরে বললেন—হেঁয়ালী করছ?

—না, হেঁয়ালী নয়। আপনি ফিরে যান।

কথার গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতায় মিষ্টার বসাক এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে এসে বললেন—এই যে এতটা পথ পার হয়ে এলাম। তা শুধু শুধু ফিরে যাবার জন্য। আর তুমি বুঝতেই পারছ এ'কদিন ক্লাবে যাওনি।

এমন নগ্ন কথায় সীমা চাটার্জী বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন আগে হলে হয়ত মনের এই অবস্থার উদ্ভব হতো না। কিন্তু আজকে

মনের পটে যে ইস্পাতের স্বাক্ষর রয়েছে, তা যে সীমা চাটার্জীর কোন দিনই বিস্মরণ হবে না।

মিষ্টার বসাক কথার কোন জবাব না পেয়ে, এবার কিছুটা এগিয়ে গেলেন। যেন কতকটা আদিম নেশার পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান।

ভয় পেলেন সীমা চাটার্জী। তাই ত্রস্তপদে পিছিয়ে গেলেন তিনি। কাতর স্বরে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন মিষ্টার বসাক।

মিষ্টার বসাক তির্যক দৃষ্টিতে হাসলেন। তারপর চাপা গলায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবে বললেন—ইম্যাচিওর মর‍্যালিটি অনেক সময় ছেলে মানুষ করে দেয় মিস্ চাটার্জী।

—সেটা আমি ভেবে দেখবো। কিন্তু প্লিজ আপনি····।

মুহূর্তে বসাকের চোয়ালের পেশী গুলো জেগে উঠল। বললেন—বড় দেরী হয়ে গেছে সেটা ভেবে দেখবার। এখন যে তার কোন পথ নেই।

—কেন পথ থাকবে না? সে পথ আমি তৈরী করে নিয়েছি।

উচ্চঃস্বরে হেসে উঠলেন মিষ্টার বসাক। কি অমানুষিক এই হাসির শব্দ। যেন একটা আসন্ন দেহ উপভোগের উল্লাসে এমন বিকৃতি ঘটেছে।

হাসি শুনে সীমা চাটার্জীর স্নায়ু গুলো যেন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এলো। পা দুটো কেমন যেন অবশ বোধ হলো।

মিষ্টার বসাক বললেন—পথ তৈরী করেছে তোমার কল্পনা। একটা ইমোশানের টাচে। যেখানে রিয়ালিটির কোন ভিত্তি নেই।

তাই বলছি, মনের এই আবেগকে দূর কোরে আমার প্র্যাক্টিকাল ওয়েতে ফিরে এসো। দেখবে এতে তুমি খুশী হবে।

সীমা চাটার্জী চুপ করে রইলেন। যেন শিকারীর মুখে পড়ে তার অনড় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এক অসহায় শিশুর মত চোখের কোন দুটো তার ভিজে উঠল।

মিষ্টার বসাক তা দেখলেন। কিন্তু তিনি তার মনের একই অবস্থা বজায় রেখে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

নিশ্চিদ্র অন্ধকার। আদিম প্রবৃত্তিটা যেন অনুকূল অবস্থায় তীব্র ভাবে জেগে উঠল। মিষ্টার বসাক একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অনুমানে বুঝলেন, শব্দটা সীমা চাটার্জীর দিক থেকেই হলো। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। এতে তো কারো ক্ষতি হয়নি।

তাই অন্ধকারে মিষ্টার বসাক শিকারীর মত এগিয়ে গেলেন সীমা চাটার্জীর দিকে। কিন্তু অনুমানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাকে ধরতে পারলেন না। ডান পাশে ঘুরতে পায়ে যেন কি লাগল। অন্ধকারে হাতরে মিষ্টার বসাকের রোম গুলো এবার শিউরে উঠল।

তিনি মুহূতেই বুঝতে পারলেন সীমা চাটার্জীর জ্ঞান শূন্য দেহটা পড়ে আছে মেঝেতে। আর তার হাতে ঘন তরলের মত কি যেন লাগল।

ভয়ে মিষ্টার বসাক তাড়াতাড়ি আলোটা গিয়ে জ্বালালেন। দৃশ্য দেখে মিষ্টার বসাকের সর্বাঙ্গ এবার কেঁপে উঠল। রক্তে তখন সীমা চাটার্জীর কাপড়ের অর্দ্ধেক অংশ ভিজে গেছে। আর মাথার পাশ দিয়ে তখনও ফোয়ারার মত রক্ত পড়ছে।

কয়েক মুহূর্ত মিষ্টার বসাক বিবশের মত চেয়ে রইলেন। তারপর দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে ক্ষতস্থানে কাপড় দিয়ে চেপে ধরলেন।

কিন্তু রক্ত তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত তখন দশটা। মিষ্টার বসাক কোনরকম সীমা চাটার্জীর অচৈতন্য দেহটাকে খাটের উপর তুলে রাখলেন। তারপর প্রায় ছুটে বেড়িয়ে গেলেন ডাক্তার ডাকবার জন্য।

রাত তখন বেশী হয়েছিল। তাই সহজে তিনি ডাক্তার পেলেন না। মিনিট কুড়ি পর তিনি হাজির হলেন ডাক্তার নিয়ে।

রাস্তায় তিনি সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন ডাক্তারকে। হঠাৎ ফিট

হয়ে পড়ে যাবার দরুন মাথা ফেটে যায়। আর সেই ক্ষতস্থানের রক্ত তিনি শত চেষ্টায়ও বন্ধ করতে পারেননি।

কিন্তু ডাক্তার দেখবার আগেই সব শেষ। কিছুক্ষণ আগে সীমা চাটার্জী বিদায় নিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে। নিথর নিস্পন্দন দেহটি তখন পড়ে আছে খাটের উপর। ঠিক যেমন রেখে প্রশান্ত বসাক বাইরে এসেছিলেন ডাক্তার ডাকবার জন্য।

ডাক্তার তবুও তার যথারীতি পরীক্ষা করলেন। বললেন—নার্ভ খুব দুর্ব্বল ছিল। আর আর্টারি ছিড়ে যাবার দরুন এমন হয়েছে।

মিষ্টার বসাক চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখবার সময় বললেন—নামটা বলুন।

শব্দ দুটি যেন প্রশান্ত বসাকের মর্মস্থলে এক প্রচণ্ড কাঁপুনির সৃষ্টি করল। মুখের রং তার বিবর্ণ হলো। আর চোখের শানিত দৃষ্টি তার নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

ডাক্তার দেরী দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কই নামটা বলুন ?

প্রশান্ত বসাক এবার ক্ষীণ গলায় বললেন—সীমা বসাক।

ডাক্তার একাগ্র চিত্তে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে বিদায় নিলেন ঘর থেকে। আর প্রশান্ত বসাক সেই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে বসে রইলেন এক গভীর শোকাচ্ছন্ন মানুষের মত।

কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে জীবনের এক গভীর মর্মান্তিক আঘাত তিনি আজ প্রথম অনুভব করলেন। আর তার সাথে খুজে পেয়েছেন জীবনের কতগুলি অজ্ঞাত অনুভূতি। যে অনুভূতি গুলি ছিল তার জীবনের বোধ শক্তির বাইরে।

তাই নিজের বুকে হাত দিয়ে প্রশান্ত বসাক বুঝতে পারলেন, আদর্শ, কল্পনা আর আবেগ—এই ভাব চেতনার মূল্য অপরিসীম। যেগুলিকে এক সময় তিনি ভেবেছিলেন—ওগুলি পৃথিবীর দুর্ব্বল মানুষের জন্য।

কিন্তু আজ তিনি স্পষ্ট বুঝেছেন, এই সবুজ পৃথিবী আর নীল

আকাশের তলায় বাঁচতে হলে চাই—জীবনের আদর্শ, মনের কল্পনা আর চাই তার গতিশীল আবেগ।

রাত্রি শেষ হলো। ভোরের কুয়াশা মুছে গেল। প্রশান্ত বসাক হিন্দু সৎকার সমিতিতে খবর দিয়ে গাড়ী আনালন। জন কয়েক ধরাধরি করে সীমা চাটার্জীর নশ্বর দেহটাকে গাড়ীতে তুলে নিল। আর তার সাথে প্রশান্ত বসাক ও বেড়িয়ে পড়লেন নিঃসাড়ে।

সব কাজ শেষ হলো। প্রশান্ত বসাক দাঁড়িয়েই সমস্ত কাজ করালেন। তারপর অবসন্ন দেহ নিয়ে, তিনি হাঁটতে শুরু করলেন অনির্দিষ্ট ভাবে। কোথায় তিনি যাবেন, তা তিনি জানেন না। কেন তিনি হাঁটছেন, তাও তিনি জানেন না। শুধু জ্ঞান শূন্য আর চেতনা বিহীন এক পথ চলা।

অবশেষে পথ শ্রান্ত পথিকের মত তিনি হারিয়ে গেলেন এক জনারণ্যে। আর তাকে দেখা যায়নি কোন রেস্তোঁরায় বা পথে। অথবা রাসেল ষ্ট্রীটের সেই ভিক্টোরিয়া ক্লাবে।

॥ ১৩ ॥

সেদিন মেসে ফিরে সুজয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর ক'দিন আর তেমন ঘর থেকে বের হয়নি।

দীননাথ বাবু তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ক'দিন থেকে চুপ চাপ রয়েছো। সেদিনের খবর তো কিছু বললে না?

সুজয় ম্লান হেসে বলল—ভদ্রলোক যে ভাবে আশা দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ালো।

—যাকগে তারজন্য অত ভাববার কি আছে। চেষ্টা কর, তুমি ঠিকই চাকরি পাবে।

এই হতাশার মধ্যে সুজয় সত্যি উৎসাহ পেলো। সুজয় নিশ্চিত

বুঝলো এই দীননাথ বাবুর আসল পরিচয় শুধু মেস মালিক নয়। এর পেছনে যে একটা অতীত জীবনের ইতিহাস আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই একদিন সুজয় জিজ্ঞাসা করলো—আপনাকে দেখলে মনে হয়—যেন একটা অতীত জীবনের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে।

দীননাথবাবু মৃদু হেসে বললেন—কি কোরে বুঝলে ?

আপনার চোখে যে সে-কথা বোঝা যায়।

মুহূর্তেই দীননাথ বাবুর ভাবান্তর হলো। একেবারে অবোধ শিশুর মত চোখ দুটি ছল ছল কোরে উঠল। তারপর বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ সুজয়। কিন্তু সেই ইতিহাস শুনে তুমি কি করবে ? তা যে দুঃখ আর বিষাদে ভরা এক করুন জীবন কথা।

সুজয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ও বুঝতে পারেনি এই স্বাভাবিক প্রশ্নে, দীননাথ বাবুর চোখ দুটি জলে ভরে উঠবে। তাই সুজয় বলল—আমাকে ক্ষমা করবেন। অজ্ঞাতে প্রশ্ন কোরে আপনাকে ব্যথা দিয়েছি।

কিন্তু দীননাথ বাবু যেন কথা শুনতে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন—জীবনে আমার সবই ছিল সুজয়। কিন্তু আজ আর কেউ নেই। একে একে সবাইকে হারিয়েছি নির্মম ভাবে। আর আমি এখনও বেঁচে আছি শক্ত পাথরের মত।

কিন্তু আশ্চর্য্য ! জীবনে আমি এমন কি কাজ করেছিলাম, যার জন্য আমাকে এমন শাস্তি পেতে হলো। তার উত্তর আমি বহুকাল খুজেছি। কিন্তু পায়নি কিছুই।

পেয়েছি শুধু সীমাহীন নিঃসঙ্গতা। আর একাকীত্বের তীব্র বেদনা। তবুও তোমরা আছো বলে, সেই দুঃখ আমি ভুলে থাকি। নইলে এই শুন্য জীবনের বোঝাকে আমি যে কখনও সইতে পারতাম না।

*　　　*　　　*

ভোটের ব্যাপারে তারিণী বাবুর মনটা বিষন্ন ছিল। প্রথমে দিন

কয়েক খুব উত্তেজনা বোধ করেছিলেন। কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, তার উত্তেজনা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এলো।

তিনি স্পষ্ট বুঝলেন বুড়ো বয়সে ছেলে ছোকরাদের কাছে এখন মান খোয়াবেন। তাই একদিন লাটু ঘোষকে ডেকে বললেন—দেখ লাটু আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে দাঁড় করাও। শরীরটা আমার ক'দিন থেকে ভাল লাগছে না। তার উপর আবার এমন ঝামেলা আমি কী সইতে পারবো ?

লাটু ঘোষ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—এখন কি কোরে তা সম্ভব। এত টাকা পয়সা খরচা কোরে পোস্টার মারা হয়েছে। তাছাড়া আর মাত্র দিন সাতেক বাকী। এর মধ্যে আপনার নাম খারিজ করলে, লোকে যে হাসবে।

—কিন্তু এদিকে কাজের নমুনা দেখেতো মনে হচ্ছে না আমি জিততে পারবো।

—কাজ আমাদের ঠিকই হচ্ছে। আপনি নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে এমন ভয় পাচ্ছেন।

তারপর শুরু হয়েছিল দুই পক্ষের ভোটের যুদ্ধ। প্রবীনে আর নবীনে। নিত্য নূতন কৌশলে কে কত বাজীমাৎ করতে পারে।

লাটু ঘোষের পয়সা ছিল প্রচুর। তাই খরচ করেছিলেন বিস্তর। ভোটের দিন চারেক আগে কলকাতা থেকে তিনি ভাড়া করে আনলেন তাসাপাটি। এমন তাসাপাটির বাজনা গ্রামের কেউ কখনও শোননি। আর কেউ চোখেও দেখেনি।

নীল পাগড়ী আর সাদা পোষাকে সজ্জিত ছিল বাজনদাররা। তারপর বিকেলে বের হলো শোভাযাত্রা। সবার আগে ছিল তারিণী চক্রবর্ত্তীর একখানি ছবি। তারপর শুরু হলো তাসা পাটির বাজনা।

বাজনা আর নাচে শালুকপুরের হাওয়া তখন উন্মাদ হয়ে উঠল। এমন বাজনা আর তার সাথে কোমড় দুলানো নাচ দেখে শালুকপুরের লোকেরা একেবারে তাজ্জব। তারা ভাবতে পারেনি এমন বাজনার

সাথে ছেলেদের আবার মুখ বিকৃতি কোরে নাচবার ব্যবস্থা আছে।

ভীড় জমেছিল প্রচুর। আর বাজনা বেজেছিল অনেকক্ষণ। তাই ভবতারণবাবু একটু দমে গিয়েছিলেন। তাই পরদিন হারুকে ডেকে বললেন—দেখলে তো কাল লাটু ঘোষ কেমন বাজীমাৎ করল? তোমরা এবার একটা পাল্টা জবাব দাও।

—আমরাও ভাবছি। দেখি কি করা যায়।

এমন কথায় ভবতারণবাবু খুশী হলেন না। তিনি বললেন—এখনও ভাববে? আর ভোটের তো মাত্র দিন কয়েক বাকী আছে।

শেষ পর্যন্ত নূতন কিছু স্থির করতে না পেরে। সেদিনই হারু ব্যবস্থা করল এক শোভা যাত্রার। গ্রামের যত সাইকেল রিক্সো ছিল সব এনে জমা করল এক জায়গায়। তারপর তাদের সাথে বেঁধে দেওয়া হলো নানা রকমের প্রচারপত্র। আর হারু, খাদু, ভ্যাবলা একটি ভাড়া করা জীপ গাড়ীতে বসে মাইকে ঘোষণা করতে লাগল ভবতারণবাবুর প্রশংসা।

একেবারে মন্দ হয়নি। যদিও এই ধরণের শোভাযাত্রা বছর খানেক আগে একবার হয়েছিল। কিন্তু তখন এত সাইকেল রিক্সো ছিল না। আর এত দীর্ঘ পথও অতিক্রম করা হয়নি।

রাত্রিতে পুঁটির মা তারিণীবাবুকে বললেন—ভোটের যা অবস্থা দেখছি, তাতে কোনপক্ষ জিতবে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—না বোঝবার কি আছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমি জিতবো। আর জানতো লাটু ঘোষ আমার জন্য কম খরচা করেনি।

—শুধু খরচ করলেই বুঝি ভোটে জেতা যায়। এইতো আজকে বিকেলে ভবতারণবাবুর মিছিল দেখলাম। শুনলাম, রিক্সোওয়ালারা এরজন্য এক পয়সা ভাড়া নেয়নি। বিনা পয়সায় তারা ভোটের জন্য খেটেছে।

কিন্তু তোমারা টাকা পয়সা খরচা করে শুধু হৈ চৈ করলে। কই,

ওদের মত তো পাঁচটা লোককে বোঝাতে দেখলাম না। কেন তোমাকে লোকে ভোট দেবে। আর কেনই বা ভবতারণবাবুকে ভোট দেবে না।

তারিণীবাবু মনে একটু আঁচড় খেলেন। বললেন—আরে আমি কি ভোটে নামতে চেয়েছিলাম! আমাকে যে জোর কোরে নামিয়েছে।

—আহা তুমি যেন কচি খোকা। বুড়ো বয়সে ভীমরতি। অন্য কাজে নামলে তবু বুঝতাম। একেবারে গ্রামের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য মেতেছ।

তারিণীবাবু এবার বিষণ্ণ ভাব কাটিয়ে প্রসন্ন হলেন। তাই মুচকি হেসে বললেন—এতদিন যাকে নিয়ে ঘর করলে গিন্নি, তাকে তুমি এখনও চিনতে পারলে না। এটুকু মনে রেখো তারিণী চক্রবর্ত্তী বিনা লাভে কখনও পা বাড়ায় না।

পুঁটির মা অবাক হলেন। কারণ গ্রামের প্রেসিডেন্ট হয়ে, এতে আর এমন কি লাভের ব্যাপার আছে। তাই ব্যাপারটা তার পুরোপুরি বোধগম্য হলো না। তিনি বললেন—তোমার কথার প্যাঁচ বাবা আমি ভাল বুঝি না। একটু খোলসা করে খুলে বল।

—ভোটে যদি দাঁড়াতে পারি, সামাজিক মর্য্যাদা যে বৃদ্ধি পাবে তাতো বোঝ নিশ্চয়ই।

—কিন্তু এই সামাজিক মর্য্যাদায় এমন কি লাভ হবে?

—লাভ আছে গো! অনেক লাভ আছে! যেমন ধর তখন আমি ইচ্ছে করলে বাড়ীর সামনে একটা টিউব্-ওয়েল বসাতে পারি। বাড়ীর কাঁচা রাস্তাটা পাকা করতে পারি। তাছাড়া লোক তখন প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। নানা রকম অভিযোগ এনে তারা বলবে—আমাদের এদিকটা একবার দেখুন তারিণীদা। ওদিকটায় আপনি বড় বেশী নজর দিয়েছেন।

আমি তখন কিছুটা উপেক্ষা আর আগ্রহ মন নিয়ে কথা বলবো। বেশী আগ্রহ নিয়ে কথা বললে, ভাববে আমার কোন ব্যক্তিত্ব নেই। তাই তখন মনটাকে একটু কৃত্রিম কোরে তুলবো।

পুঁটির মা বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখ তোমার ব্যক্তিত্ব, কৃত্রিম এই সব ছাইভস্ম কথা আমি বুঝি না। সাদা কথায় বল এতে পুটির বিয়ের কিছু এগোবে কিনা।

—এই তো গিন্নী এতক্ষণে আসল কথায় এসেছ। আমি আশা করছি প্রেসিডেন্টের ছাপটা পড়লে ভাল পাত্রের জন্য খুব একটা ভাবতে হবে না। তখন গ্রামের পাঁচজনই ছেলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

—ঐ আশায় বসে থেকো না। মেয়ের দিকে একটু নজর দাও। দেখতে দেখতে তো সতেরো পাড় হলো। আর কতদিন এভাবে ঘরে রাখবে।

ভোটের দিন ভবতারণবাবুর মুখটি শুকিয়ে গেল। তিনি খুব ভাল ভাবেই বুঝেছেন এবার তার প্রচার কাজ ভাল হয়নি। বরং লাটু ঘোষই প্রচারের নূতন কৌশলে কিস্তিমাৎ করেছে। তাই মনে মনে এক পরাজয়ের আশঙ্কা তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে তারিণীবাবুর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ভোটের দু'দিন আগে হাঁপানী রোগটা বেড়ে যাওয়ায় তিনি বিছানা নিয়েছেন। আর বেদম কাসিতে ভোট তার মাথায় উঠেছে।

কিন্তু এজন্য পুঁটির মা তাকে রেহাই দেয়নি। সারা দিনে অন্ততঃ একশোবার তারিণীবাবুর শ্রাদ্ধ করেছেন। গলা চড়িয়ে বলেছেন—আমি হাজার বার বারণ করেছিলাম, এমন ভোজবাজীতে তুমি যেও না। এখন ঠেলা সামলাও। আমি এখন কিছু করতে পারবো না। দেখি তোমার সাকরেদরা এখন কি করে।

যথা সময়ে ভোটের ফল বের হলো। শেষপর্যন্ত ভবতারণ বাবুই অনেক ভোটে জিতলেন। হৈ হল্লা করে সেদিন সারারাত্রি কাসর ঘণ্টা বাজলো। আর তারিণীবাবু রোগ শয্যায় শুয়ে কেবল মনে মনে লাটু ঘোষকেই গালাগালি দিলেন।

॥ ১৪ ॥

রাত্রিতে খাওয়ার শেষে মেসের সবাই একত্রে জমা হয়। কারণ খাওয়ার পড়ে তখন তাদের ঘুমুতে ইচ্ছে করে না। তখন চেনা মুখ গুলির সাথে একটু গল্প গুজব করতে ভাল লাগে। নইলে মনে হয় দিনটা যেন তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

সুজয় সেদিন খাওয়া সেরে মাকে একটি চিঠি লিখছিল। ইতিমধ্যে মেসের সভ্যদের বৈঠক বসেছে। বৈঠকে সুজয়কে অনুপস্থিত দেখে, বটুক বাবু জোরে হাঁক দিলেন।

সুজয় শুনতে পেলো বটুক বাবুর ডাক। তাই আর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল চিঠিখানি রেখে। নইলে এখুনি হয়তো ঘরে সমন এসে হাজির হবে।

সুজয় উপস্থিত হতে বটুক বাবু বললেন—আজকে একটা সুখবর আছে সুজয় বাবু। আমার এক বন্ধু মার্চেন্ট ফার্মে কাজ করে। সেই অফিসে আগামী শনিবার অ্যানুয়াল ফাংশান হবে। তাতে আমার বন্ধু অ্যামিউজমেন্ট সেক্রেটারী। ওকে আপনার নামটা গান গাইবার জন্য লিখে নিতে বলেছি।

সুজয় আপত্তি করল না। এ'কদিন অফিসের দরজায় হেঁটে পা দুটো ওর ব্যথা হয়ে উঠেছে। সুতরাং অফিসে গিয়ে যদি একটু আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায়, তা আর মন্দ কি।

শনিবার দিন বটুক বাবু তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরলেন। ফেরার পথে একটি আফ্‌গান স্নো কিনে আনলেন। ভাল জায়গায় যাবেন। সুতরাং পোষাক পরিচ্ছদে আর মুখাবয়বে একটু পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার!

সুজয় আজ মেসের বাইরে যায়নি। সকাল থেকেই অলসভাবে ঘরে বসেছিল। আর অসংলগ্ন ভাবে গল্প করেছে সনাতনের সাথে।

সনাতন বলে—যাই বলুন দাদাবাবু। কলকাতা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে। রাত্রিতে রাস্তায় বেরলে মনটা যেন কেমন কেমন করে।

সুজয় হেসে বলে—কি কেমন করে ?

—এই যেমন ধরুন রাস্তার লাল আলো। দোকানের সাদা আলো। আবার ঝিক্ ঝিক্ আলো।

সুজয় এবার হেসে উঠে বলল—ঝিক্ ঝিক্ আলো কিরে ?

—ঝিক্ ঝিক্ আলো বোঝেন না ? দেখবেন বড় বড় বায়স্কোপে আর বড় বড় দালানে টানানো ছবির মধ্যে ঝিক্ ঝিক্ আলো দেখা যায়। সেগুলি একটার পর একটা নিভতে নিভতে নিভে যায়। আবার একটার পর একটা জ্বলে উঠে। এগুলিকে বলে ঝিক্ ঝিক্ আলো।

সুজয় এবার উচ্চঃস্বরে হেসে উঠল। বটুক বাবু তখন ঘরে ঢুকলেন। হাসি শুনে বললেন—কি ব্যাপার এমন জোরে হাসছেন ?

—আর বলবেন না। আমাদের সনাতনের ঝিক্-ঝিক্ আলোর কথা শুনছিলাম।

বটুক বাবুও হেসে বললেন—এই গল্পও সবার-কাছেই করে।

বেলা পাঁচটা বাজল। বটুক বাবু সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুলেন। তারপর ধোয়া পাঞ্জাবী পড়ে মুখে আফ্গান স্নো মাখলেন।

বটুক বাবু সুজয়কেও স্নো মাখালেন। সুজয় প্রথমে হেসে আপত্তি করেছিল। কিন্তু বটুক বাবু বললেন—এসব জায়গায় একটু সেজে গুজে যেতে হয় মশাই। নইলে যে লোকের নজরে পড়া যায় না।

তারপর দু'জনে সিগারেট ধরিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালো। বাসের ভীড় দেখে বটুক বাবু বললেন—এই ভীড়ে বাসে উঠলে, জামার ইস্ত্রী একেবারে কিছু থাকবে না। চলুন ট্যাক্সি করে যাই, এতে মেজাজটা ভাল থাকবে।

বটুক বাবু তাই করলেন। ট্যাক্সি করেই তারা উপস্থিত হলেন সেখানে। তারা ঢুকে যাবার পর মানসী এলো গাড়ী কোরে। সঙ্গে এসেছে শুধু বাড়ীর ড্রাইভার।

সুরেনবাবুরও আসার কথা ছিল। কারণ এই মার্চেন্ট ফার্মের কিছু শেয়ারের অংশীদার তিনি। তাই বিশেষ নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলেন এই অফিসের ম্যানেজারের কাছ থেকে। কিন্তু অকস্মাৎ শরীর খারাপ হওয়াতে, তিনি নিজে আর আসতে পারেন নি। তাই সৌজন্যতার খাতিরে তিনি পাঠিয়েছেন মানসীকে।

সামনের সারিতে গিয়ে মানসী বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হলো।

বটকবাবুও এক পেছনের চেয়ারে বসেছিলেন। আর সুজয় ছিল আসরের শিল্পীদের ঘরে। কিন্তু নিজেকে ও ঠিক মিলিয়ে নিতে পারছিল না তাদের সাথে। একেবারে নূতন। কেউ ওকে চেনে না। তাই ও একলাই ঘরের এককোণে চুপ কোরে বসেছিল।

কয়েকজন শিল্পীর গান-গাওয়ার পর সুজয়ের ডাক পড়ল। খুব সাধারণ ভাবে সুজয়ের নাম ঘোষণা করা হলো। একেবারে অখ্যাত। কলকাতার ফাংশানে একেবারে অচল। তাই নাম শুনে অনেক শ্রোতা কিছুটা উপেক্ষার ভাব দেখাল।

কিন্তু নামটা শুনে মানসীর মনে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। পরক্ষণে ভাবল বোধ হয় অন্য কেউ হবে। কলকাতায় ঐ নামে কত লোকই তো আছে। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ হবে। আর তাছাড়া সুজয়ই বা আসবে কি করে এই অফিস ফাংশানে।

মঞ্চের পর্দাটা ধীরে ধীরে উঠল। মানসী তবুও উৎসুক হয়ে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত সুজয়কে সশরীরে দেখে এক বিপুল বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

গান শুরু করল সুজয়। এতক্ষণ যে সকল শ্রোতারা উপেক্ষা প্রকাশ করেছিল তারাও যেন ধীরে ধীরে শান্ত হলো। অপুর্ব্ব এক সুরের মুছনায় সুজয় তখন এক ভাব গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি শ্রোতা তখন সঙ্গীতের দোলায় একাত্ম হয়ে পড়েছে।

মানসীও অনুভব করল এই সঙ্গীতের গভীর পরশ। কিন্তু

শুধু শ্রোতাদের মত অনুভব করেই মানসী নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না। তার চেয়েও বেশী ছিল ওর হৃদয়ের অনুভব শক্তি। তাই এক অনির্ব্বচণীয় ভাবাবেগে মানসীর অধর যেন বার দুয়েক কেঁপে উঠল। আর শত প্রয়াসেও মানসী আজ চোখের জলকে ধরে রাখতে পারল না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর মানসী খোঁজ করল সুজয়ের। কিন্তু অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কোন সঠিক খবর দিতে পারল না। উপরন্তু তারা বললেন—আমরা নিজেরাই পর্যন্ত ভদ্রলোকের সাথে ভাল করে আলাপ করতে পারলাম না। গেয়েই অমনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আশ্চর্য্য ভদ্রলোক !

সুজয়ের দেখা না পেয়ে মানসী এক গভীর বেদনা নিয়ে গাড়ীতে উঠল। তবে মন ওর একেবারে বিষাদ হয়নি। বরং মনে মনে বেশ খুশী হয়েছে সুজয়ের জনপ্রিয়তা দেখে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে সেই ভাবমগ্ন মনটা ওর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঘরে তখন বাড়ীর ডাক্তার মিষ্টার রায় ছিলেন।

তিনি মানসীকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রেসারটা একটু বেড়ে গেছে। এখন ক'দিন কমপ্লিট রেষ্ট নিতে হবে।

মানসীর উদ্বিগ্ন কিছুটা শান্ত হলো। তারপর বলল—কোন ওষুধ আনাতে হবে না ডাক্তার বাবু ?

—ওষুধ আমার ব্যাগেই ছিল। সমস্ত টেবিলে রেখেছি। দু'ঘণ্টা অন্তর শুধু সারপাসিল ট্যাবলেটটা খাওয়াবেন। আর রাত্রির দশটা নাগাদ শুধু একটা পারসনিড ট্যাবলেট দেবেন।

ডাক্তার রায় চলে যাবার পর মানসী বাবার ঘরে ঢুকল। বাড়ীর রাঁধুনি তখন আইস ব্যাগটা ধরে বসেছিল। মানসী তার কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে, নিজেই বসল বাবার শিয়রে।

মিনিট কুড়ি পর সুরেনবাবু চোখ খুললেন। মানসীকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কখন এলি মা ?

—কিছুক্ষণ হয়েছে বাবা।

দেওয়ালের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে বললেন—রাত হয়েছে মা। শুয়ে পড়গে যা।

সুরেনবাবু আবার চোখ বুজলেন। মানসী ধীরে ধীরে গায়ের কম্বলটা ভাল করে টেনে দিল। তারপর ঘরের মৃদু আলোটি জ্বালিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে এলো।

রাতটা ভালই কাটলো। পরদিন সকালে সুরেনবাবুর চোখ মুখ অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখাল। বেলা বাড়তে ডাক্তার রায় এলেন। যথা-রীতি তিনি প্রেসারটা পরীক্ষা করলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন—এখন নরম্যাল্ আছে। বেশী নড়াচড়া করবেন না। অন্ততঃ দিন সাতেক বিশ্রাম নিন।

সুরেনবাবু হেসে বললেন—বিশ্রাম কি নেওয়ার সময় আছে। তাহলে অফিসের সমস্ত কাজই বন্ধ হয়ে থাকবে।

—শরীরটাকে একটু দেখুন। নইলে যে একেবারে অসুস্থ হয়ে পরবেন।

সুরেনবাবু ডাক্তারের নিষেধ কে অমান্য করেননি। দিন সাতেক পরেই তিনি অফিসে যাতায়াত শুরু করলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষ। আগের চেয়ে কাজের চাপ অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। এজন্য অফিসের একজন পুরনো লোককে প্রমোশন দিয়েছেন। তিনিই এখন বেশীর ভাগ কাজ দেখাশুনা করেন।

কিন্তু মানুষের বিপদ যেন সব কিছু সতর্কতার বাইরে গোপন করে থাকে। তাই একদিন অকস্মাৎ অফিসের টেবিলে সুরেনবাবু মূর্ছা গেলেন। অনেকক্ষণ তিনি ঐ অবস্থায় ছিলেন। তারপর অফিসের এক পিয়ন দেখে সরগোল তুলল। ধরাধরি করে তাকে অফিস বেড়ে

শুইয়ে দেওয়া হলো। তারপর ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, করণারী থ্রম্বসিস্।

বাড়ীতে নিয়ে আসার পর সুরেনবাবুর জ্ঞান ফিরল। সামনে মানসীকে দেখে সুরেনবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সাশ্রু নয়নে তিনি মেয়ের হাত ধরে বললেন—এবার বোধ হয় আর ভাল হয়ে উঠতে পারবো না রে।

মানসীর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। দু'চোখ বেয়ে ওর জল নেমে এলো। বলল—কেন পারবে না বাবা, ওকথা তুমি বলো না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুরেনবাবু বললেন—জলধরের ছেলেকে বাড়ীর দলিলটা ফিরিয়ে দিস। বড় ভাল ছেলেরে। আমি সেবারই দলিলটা ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু ও যে ঠিক ওর বাপের মত হয়েছে। কারো দেওয়া জিনিষ ও যে সহজে গ্রহণ করবে না। একটু বুঝিয়ে বলিস মা। যেন সে ফিরিয়ে না দেয়।

এই কথা কটি বলে সুরেনবাবু যেন অস্বাভাবিক হাঁপিয়ে উঠলেন। দৃষ্টি শক্তি যেন তার ক্রমশঃ নিভে এলো। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট বোধ হলো। অবশেষে অচেতন মনে হাত দুটো শূন্যে তুলে দিয়ে তিনি যেন কী ধরবার চেষ্টা করলেন। তারপরই একপাশে নুয়ে পড়ল তার মাথাখানি।

টেলিগ্রাম পেয়ে নায়েব দেশ থেকে এলেন। সঙ্গে পিসিমাও এসেছেন। এমন মর্মন্তুদ ঘটনায় তিনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পরেছেন। আর মানসীর দিকে তাকালে তার ব্যথার জ্বালাটা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠে।

নায়েব মশাই দেখে শুনে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো করালেন। তারপর মত চাইলেন শ্রাদ্ধ শান্তি কোথায় করা হবে।

পিসিমা মত দিলেন গ্রামে করার জন্য। কারণ এখানে তেমন চেনা জানা লোক নেই। আর এখানে কাজ করে তেমন তৃপ্তিও পাওয়া যাবে না। তাই তিনি মানসীকে নিয়ে রওনা হলেন দেশের বাড়ীতে।

॥ ১৫ ॥

বটুকবাবু সেদিন গানের আসরের কথা বলছিলেন। মেসের আরেক ভদ্রলোক বললেন—গান তো সুজয়বাবু খুব ভাল গেয়েছেন শুনলাম কিন্তু টাকা পয়সা পেয়েছেন কি ?

—টাকা পয়সা পাবো কি মশাই। পাওয়ার আগেই তো সুজয়বাবু চলে এলেন। এমন কি ভদ্রলোকেরা যে একটু মিষ্টিমুখ করাবেন, তার পর্যন্ত সময় পেলেন না। হঠাৎ কী যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ঠিক তাই। সুজয় নিজেও জানেনা কেন সেদিন ওভাবে চলে এসেছিল। তবে আসরে মানসীকে দেখবার পরই সুজয়ের মনে এই বিভ্রান্তি ঘটেছিল।

দুপুরের দিকে সুজয় কতগুলি অফিসের ঠিকানা নিয়ে মেস থেকে বেরল। দিন কয়েক আগে এই ঠিকানাগুলি একটি টেলিফোন গাইড থেকে লিখে রেখেছিল। হাতে ওর বটুক বাবুর একটি পলিথিনের ব্যাগ। আর এই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে ওর ছাত্র জীবনের কতগুলি প্রশংসা পত্র।

প্রথম অফিসটা পড়ল রাধাবাজার ষ্ট্রীটে। সুজয় অফিসে ঢুকে একটি স্লিপ্ লিখে দারোয়ানের হাতে দিল। দারোয়ান ভেতর থেকে এসে সুজয়কে নিয়ে গেল বড় বাবুর কামড়ায়।

বড়বাবু সুজয়ের হাতে ব্যাগ আর মার্জিত চেহারা দেখে ভাবলেন—উনি বোধ হয় অন্য কোন ফার্মের প্রতিনিধি। তাই তিনি সুজয়কে সাগ্রহে বসতে দিলেন। তারপর সুজয়ের আগমনের কারণটি জেনে বড়বাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন।

মুখ গম্ভীর করে বললেন—এভাবে চাকরির জন্য অফিস টাইমে এসে কাজের ডিসটাব করা আপনার উচিত হয়নি।

সুজয় বিনীত ভাবে বলল—আজ্ঞে অফিস টাইম ছাড়া আপনাকে কোথায় পাবো।

বড়বাবু আর কথা বললেন না। শুধু টেবিলের নীচে কলিংবেল খানি পা দিয়ে টিপে ধরলেন।

অনেকক্ষণ বেলটি বাইরে বাজল। কিন্তু কেউ আর এলো না। বোধ হয় দারোয়ানটি তখন অন্য কোথাও গেছে।

সুজয় এবার চেয়ার ছেড়ে উঠল। এতক্ষণ ও দারোয়ানটির অপেক্ষায় ছিল। কারণ ও বুঝতে পেরেছিল, কেন তিনি এই কলিং বেলখানি টিপেছিলেন। তাই সুজয় মনে মনে স্থির করেছিল—অভদ্রতার চরম জবাব ও এখানে দিয়ে যাবে।

কিন্তু তা আর যখন হলো না। তখন বড়বাবুকে একটি বিদ্রূপ পূর্ণ নমস্কার দিয়ে, সুজয় বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

রাধাবাজার থেকে হেটে এসে সুজয় ক্যানিং ষ্ট্রীটের আরেকটি অফিসে উপস্থিত হলো। সুজয় এবার কোন শ্লিপ্ না পাঠিয়ে অনুমানে অফিসের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকল।

খাস কামড়ার মালিক মাড়োয়ারীটি ভাবল সুজয় বোধহয় সেলট্যাক্স অফিস থেকে এসেছে। কারণ আগে যিনি ছিলেন, তিনি মাস খানেক যাবৎ অন্যত্র বদলি হয়েছেন। তাই মাড়োয়ারীটি খাতির কোরে বলল—বসুন বাবু বসুন।

সুজয় সলজ্জ ভাবে একটি চেয়ারে বসল। কিন্তু ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এতটা খাতিরের কারণ কী।

তারপর মাড়োয়ারী একটি সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিল সুজয়ের দিকে। সুজয় দ্বিধাভরে একটি সিগারেট ধরালো।

মাড়োয়ারীটি বলল—আপনার এক্স অফিসার তো অন্য জোন-এ

ট্রান্সফার হয়ে গেছে। সরকারী কাজের ঐ একটু অসুবিধা বাবু। কুথাও বেশীদিন স্টেডি হওয়া যায় না।

সুজয় এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য সুজয় ব্যক্তিগত কারণটি বলতে পারল না। আর বললেও হয়ত আগের মত অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সুজয় অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল—আজ উঠি শেঠজী। অন্য আরেকদিন আসবো।

মাড়োয়ারীটি উৎসাহ পেয়ে বলল—হ্যাঁ বাবু। এই বাত ঠিক আছে। আপনার খুশীতে কাম করুণ।

সুজয় এবার উঠবার চেস্টা করল। মাড়োয়ারীটি মোলায়েম স্বরে বলল—অ্যাই বাবু। এই কেয়া বাত আছে। কুছ মিঠাই খেয়ে জানতো।

সুজয় এবার বিপদে পড়ল। পাছে ওর আসল পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই প্রবল আপত্তি জানিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাড়োয়ারীটি একটি সাদা খাম সুজয়ের হাতে গুজে দিল। সুজয় ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারল না। বরং নিজের পরিচয়টা গোপন রাখবার জন্যই সুজয় খামটা না খুলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেড়িয়ে এলো।

বাইরে এসে সুজয় এক গভীর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল কী বিপদেই না পড়েছিল। ধরা পড়লে প্রতারণার দায়ে একেবারে লালবাজারে পাঠাতো। যাক মানে মানে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এই যথেস্ট।

তারপর সুজয় আর কোন অফিসে যায় নি। সোজা সেখান থেকে মেসে চলে এলো। গা থেকে জামাটি খুলতে গিয়ে, সেই সাদা খামটি মেঝেতে পড়ল।

সুজয় এক কৌতুহল নিয়ে খামটি খুলতেই ওর হৃদপিণ্ডটা প্রচণ্ড জোরে নড়ে উঠল। সুজয় বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। সুজয় গুণে দেখল চারখানা একশো টাকার নোট।

তাড়াতাড়ি খামটা পকেটে পুরে সুজয় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাল। দরজা জানালা বন্ধ করে আবার নোট কটি গুণে দেখল। আর একটা অস্বস্তিতে সমস্ত গা দিয়ে তখন ওর ঘাম ঝরছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলো ওর মনে। তাই সুজয়ের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল এক চরম শঠতার ভাব। তারপর বন্ধ জানালাটি খুলে দিয়ে সুজয় তক্তোপশের উপর গিয়ে বসল।

কখন রাত্রি হয়েছে সুজয় টের পায়নি। প্রায় মধ্য রাত্রিতে ওর ঘুম ভাঙ্গল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে দেখল পকেটে খামটি ঠিক আছে কিনা।

সুজয় ভাবল, ভালই হয়েছে। হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। আর কদিন বাদেই তো ফিরতে হতো। ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত ইনস্‌পেক্টরের ভাগ্যটা। এখন আরো কদিন নিশ্চিন্ত থাকা যাবে কলকাতায়।

কিন্তু যখন মাড়োয়ারীটি জানতে পারবে? তখন বেচারী হয়ত শোকে ভেঙ্গে পড়বে। আর ভাববে কি মারাত্মক প্রতারণা। ছিঃ ছিঃ শেষ পর্যন্ত ও এই কাজ করল। লজ্জায় আর ঘৃণায় সুজয়ের সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

দরজায় এবার ঠক ঠক শব্দ হলো। সুজয় কান পেতে শব্দগুলো শুনলো। আর চোখের দৃষ্টিটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তারপর এক বিপদের আশঙ্কায় দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

আবার সেই আগের মতন গুরু গম্ভীর ঠক্ ঠক্ শব্দ। সুজয় সতর্ক হয়ে দরজাটি খুলল। দেখল মেসের সনাতন তখন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় সনাতন প্রতিদিনই চা নিয়ে আসে। কিন্তু আজকে এক অশুভ উত্তেজনায় সুজয়ের সেটি আদৌ মনে ছিল না। তাছাড়া

কখন যে ভোর হয়েছে তা ও মোটেই টের পায়নি। তাই নিজের কাছে লজ্জা পেয়ে সুজয় সনাতনকে বলল—সাড়া দিতে পারিস না।

সনাতন অবাক হলো। কারণ এমন প্রশ্নের জন্য ও মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ও তো এমন ভাবে প্রতিদিনই আসে। আর সুজয়ের চোখ মুখের চেহারা দেখে সনাতনও বেশ আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে গেল।

বেলা বাড়তে সুজয় স্নানটা সেরে এলো। আজ আর বাইরে বেরল না। সকাল সকাল খেয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর এলো না। কেবলই গত কালের ঘটনাটি কেমন যেন ওকে হুল ফোটাতে লাগল।

এতদিনের শিক্ষা আর আদর্শ সুজয় শুধু চারশো টাকার বিনিময়ে ধুয়ে মুছে দেবে। এর কি কোন মূল্য ও রাখবে না! তাহলে এতদিন ও কিসের আত্মসম্মান নিয়ে চলেছে? নইলে চাকরির জন্য কেনও মিষ্টার বসাকের সাথে হাত মেলাল না। অথবা তারিণীবাবু যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা কেন সুজয় মেনে নিল না।

সেটা তো আরো সহজ। আরো সরল ছিল। সেখানে তো কোন তিক্ততার ক্লেদ ছিল না। শুধু হাত পেতে নিতে হতো ওকে।

সুজয় আর ভাবতে পারল না। একটি অসহায় শিশুর মত আর্ত্তনাদ করে বিছানা থেকে উঠে বসল। বুকের ভেতর তীব্র একটা ব্যথা জ্বলতে লাগল। ও যেন আর সহ্য করতে পারছে না এই প্রতারণা। এ যেন ওর জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়। তাই তাড়াতাড়ি জামাটি গায়ে দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে সুজয় দ্রুত রওনা হলো মাড়োয়ারীর অফিসের দিকে।

অফিসে ঢুকে সুজয় যখন খামের টাকাগুলো মাড়োয়ারীর হাতে দিল। সে ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে অত্যন্ত ভয় পেলো। ভাবল, অল্প টাকায় ইনস্‌পেক্টরবাবু বোধ হয় খুশী হয় নি।

সুজয় বলল—শেঠজী আমি কোন ইনস্‌পেক্টর নই। আমি

এসেছিলাম চাকরির খোঁজে। তা আপনি আমাকে সেলট্যাক্সের লোক ভেবে টাকাগুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। আপনি টাকা গুলো ফেরৎ নিন। আর এই আমার ঠিকানা। যদি কখনও আপনার অফিসে ভ্যাকান্সি হয়। তাহলে এই ঠিকানায় আমাকে খবর দেবেন।

মাড়োয়ারীর কাছে ব্যাপারটি একটি ধাঁধার মত মনে হলো। বুঝতে গিয়ে আরো সে জট পাকিয়ে ফেলল। তাই শুধু স্থির দৃষ্টিতে একটি বিস্ময়ের ভাব নিয়ে সে তাকিয়ে রইল সুজয়ের দিকে।

তারপর সুজয় সেখানে থেকে বেড়িয়ে এলো। একটি পাপের বোঝা যেন ওর দেহ থেকে নেমে গেল। শেষ পর্যন্তও মহৎ ভাবে জিতেছে। জীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস ও রাখতে পেরেছে। তাই এক অসীম আনন্দে হাত দুটো উপরে ছড়িয়ে দিল। আকাশের নীলিমায় আর বাইরের মুক্ত বাতাসে ওর দেহ আর মন যেন অধিক হাল্কা বোধ হলো।

* * *

এই ঘটনার পর সুজয় আর চাকরির চেষ্টা করেনি। সমস্ত জামা কাপড় ও সুটকেশে তুলে রেখেছে। আর ক'দিন বাদেই ও দেশে ফিরে যাবে।

মনটা ওর ভয়ানক খারাপ লাগল। বি. এ, পাশ করেও একটি শক্ত সমর্থ মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। তবে এর কি মূল্য আছে এই পড়াশুনায়। যদি না এই বিদ্যায় নিজের মনের মত বেঁচে থাকা যায়।

বটুকবাবু বার বার বলেছেন। এতটা ভেঙ্গে পরবেন না মশাই। কাজ আপনার ঠিকই হবে। তবে একটু দেরী হচ্ছে। তাই বলে গ্রামে ফিরে জীবনের সুযোগগুলি নষ্ট করবেন না।

সুজয়ের মনঃপুত হয়নি কথাগুলো। তাই ভাবল সন্ধ্যায় কলকাতার বাসায় সুরেন বাবুর সাথে দেখা করে আসবে। কোন সুযোগের আশায়

নয়। তাকে বলে আসবে তিনি যেন আগামী মাসে, ওদের বাড়ীটা দখল করে নেয়। ও মাকে নিয়ে উঠে যাবে অন্য কোথাও। ওর আর ঋণ পরিশোধের সামর্থ নেই। তাই শুধু শুধু সময় নিয়ে ও তার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চায় না।

বিকেল থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি নামল। অবিশ্রান্ত ভাবে অনেকক্ষন বৃষ্টি হলো। সুজয়, সুরেন বাবুর বাসায় যাবার জন্য দরজায় এসে দাঁড়ালো। রাস্তায় তখন জল জমেছে। রাস্তায় নামলেই জুতো একেবারে ভিজে যাবে।

সুজয় ভাবল আজ বেরবে কিনা এই জলে। রাস্তায় লাইটগুলো তখনও জ্বলে উঠেনি। গলিটা যেন কেমন অন্ধকার মনে হলো. সহসা দূর থেকে একটি গাড়ীর হেড লাইট জ্বলে উঠল। সুজয় দেখতে পেলো একটি কাল রংয়ের অ্যামবাসাডার মেসের দিকে এগিয়ে আসছে।

গাড়ীটি একটি বাড়ীর সামনে এসে থামল। তারপর ড্রাইভার কি যেন জিজ্ঞাসা করে আবার জল ঠেলে অতি ধীর গতিতে চালাতে শুরু করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে গাড়ীটি মেসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সুজয়কে দেখে গাড়ীর ড্রাইভার একটি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল।

সুজয় বলল—হ্যাঁ আমার নামই সুজয় রায়।

এবার গাড়ীটির পেছনের সীট থেকে, সেই ক্যানিং ষ্ট্রীটের অফিসের মাড়োয়ারীটি বলল—নমস্তে বাবু।

সুজয় যেন আকাশ থেকে পড়ল। এই ঝড় বৃষ্টিতে কি মনে করে এসেছে মাড়োয়ারীটি! সুজয়ের আর কিছু বলবার অপেক্ষা না রেখে, মাড়োয়ারীটি নেমে এলো গাড়ী থেকে।

সুজয় ভদ্রতা করে তাকে নিয়ে ঘরে বসালো। মাড়োয়ারীটি বলল আপনি এত ব্যস্ত হবেন না বাবু। এক কামকে লিয়ে আয়া বাবু। আপনি পারফেক্ট ম্যান্ আছেন। আপনি জরুর পারবেন।

সুজয় বেশ কিছুটা অবাক হলো। তাই এক বিস্ময়ের ভাব নিয়ে বলল—কি কাজ শেঠজী ?

—আপনার চেহারা দেখে মনে হয়। আপনি লিখাপড়া জানেন। আর আপনার পারসন্যালিটি-ভি আছে। যেটা সবচেয়ে দরকার বাবু। আপনি বলুন আমার কথা রাখবেন।

এবার সুজয়ের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই মাড়োয়ারীটি অফিসের কোন চক্রান্ত নিয়ে এসেছে। যা ওকে দিয়ে সেই বে-আইনী কাজটি করিয়ে নিতে চায়।

তবুও সুজয় বলল—আমার দ্বারা যদি কাজ হয়, তাহলে নিশ্চয় করবো শেঠজী।

—এই বাত ঠিক আছে। আপনি হামার ওয়ারকিং পার্টনার হোনে চাই। হামার বয়স হয়েছে বাবু। আগের মত আর সব দেখতে পারি না। আর ছেলে মেয়েও নেই যে অফিসটা দেখবে। আপনি অনেস্ট আছেন। আপনি আসুন বাবু। হামার বিজিনেস্ দেখুন।

সুজয় প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না মাড়োয়ারীটির কথা। তবুও বলল—এতবড় কাজ আমি কি পারবো শেঠজী ?

—কেন পারবেন না বাবু। জরুর পারবেন। হামি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবো। কোন ডিফিকালটি হবে না।

এবার সুজয়ের গা'টা কেঁপে উঠল। দেহের রোমকূপগুলো পর্যন্ত শিউরে উঠল। চোখের দৃষ্টি যেন একটা প্রচণ্ড আবেগে ঝাপসা হয়ে এলো। আর তার সাথে সুজয় আজ প্রত্যক্ষ করল এক আশ্চর্য্যকর মানুষকে।

পরদিন সুজয় মাড়োয়ারীর অফিসে গেল। মনে তখন ওর কিছুটা সন্দেহ ছিল। কি জানি শেষ পর্যন্ত যদি তার মত পাল্টায়। তাই কতকটা সন্দিগ্ধ মন নিয়েই ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

মাড়োয়ারী সুজয়কে দেখে খুব সাদরে নিয়ে বসালো চেয়ারে।

আপন জনের মত সে অফিসের নানা প্রয়োজনীয় কথা বললেন। তারপর দরকারী ফাইলপত্র খুলে সে সুজয়কে দেখতে দিলো।

মাস কয়েক লাগল সুজয়ের সমস্ত কাজ বুঝে নিতে। তারপরই ওঁ দায়িত্বপুর্ণ পদে নিযুক্ত হলো। অফিসের চেক সইয়ের ব্যাপার থেকে সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ ফাইল এখন ওর তত্ত্বাবধানে।

অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। আর তার সাথে তাদের কৌতূহল মনটাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কৌতূহল নিবৃত্তি করার যে কোন উপায় ছিল না। কারণ নব নিযুক্ত বাবুটি যে তাদের সমগোত্র নয়। নইলে এতদিনে তার জন্মরাশি থেকে গোপন প্রণয় পর্যন্ত তারা বার করে ফেলতো।

কিন্তু তবুও এরজন্য অফিসের কর্মচারীদের খুব একটা আক্ষেপ নেই। বরং তারা সুজয়ের আবির্ভাবে খুসীই হয়েছে। আর প্রয়োজনে ওর সাথে কথা বলে তারা আন্তরিকতার স্পর্শও পেয়েছে।

॥ ১৬ ॥

প্রথম মাসের বেতন থেকে সুজয় এখানকার সমস্ত ঋণ শোধ করল। সবচেয়ে বেশী ঋণ হয়েছিল দীননাথ বাবুর কাছে।

টাকাটা নেবার আগে দীননাথ বাবু বললেন—টাকাটা শোধ দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন। প্রথম চাকরি করা টাকাটা বাড়ীতে পাঠাও। পরে না হয় আমার টাকাটা দিলে চলবে।

সুজয় বলল—বাড়ীতে কিছু টাকা পাঠিয়েছি। এখন শুধু আপনার আর বটুক বাবুর টাকাটা বাকি আছে।

দীননাথ বাবু টাকাগুলি রাখলেন। তারপর সুজয় বটুক বাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে টাকাক'টি দিতে গিয়ে, বটুক বাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—এটা আপনার কি ধরণের শিষ্টাচার।

সুজয় বুঝতে পেরে মৃদু হাসল, বলল—না, আপনার টাকাকটি রাখুন।

—এই সামান্য টাকাটা শোধ করে বুঝি সম্পর্ক মিটিয়ে দিতে চান।

সুজয় জিভে কামড় দিয়ে, বলল—ছিঃ ছিঃ ওকথা মুখে আনবেন না! আপনি আমার পরম বন্ধু। আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—তাই বুঝি টাকাটা ফেরৎ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এবার সুজয় আর কিছু বলল না। তবে বটুক বাবুর মুখ দেখে মনে হলো যেন টাকা কটি সেধেও ভুল করেছে।

বটুক বাবু বললেন—শুনলাম আপনি ঘরের খোঁজ করছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন আপনার এখানে ভাল লাগছে না?

—না ঠিক তা নয়।

তবে?

—ভাবছি এতদিন দীননাথ বাবুর লাইব্রেরী ঘরে তো রইলাম। এবার উচিত ঘরটা পরিবর্তন করা।

—তা আপনি এরজন্য মেসের বাইরে যাবার কথা ভাবছেন কেন?

—কি করবো এখনও যে কোন সীট খালি হলো না।

—সীট খালি নেই তো আপনি আমার ঘরে চলে আসুন। আমার ঘরের চোকিটা বড় আছে। দু'জনে বেশ থাকা যাবে।

—আমার জন্য আপনি কেন আবার অসুবিধা ভোগ করবেন।

—এতে অসুবিধার কি আছে মশাই। আপনাকে আমার ভাল লাগে। তাই আপনাকে কাছে পেতে চাই।

সুজয় অস্বীকার করতে পারল না। একেবারে খাটি কথা বলেছেন বটুক বাবু। আর এমন হৃদয় মাখানো কথাই যেন তিনি সব সময় বলে থাকেন।

* * *

দিন কয়েক পর বাড়া থেকে একটি চিঠি এলো। চিঠি খানি

লিখেছেন সুজয়ের মা। এই চিঠির মধ্যেই সুজয় সুরেনবাবুর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারল।

এই দুঃসংবাদ পেয়ে সুজয় একেবারে উদাসীন হয়নি। তাই বার কয়েক সুরেনবাবুর চেহারাটা ওর মানস পটে ভেসে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণে সুজয় ঋণের কথাটি ভাবল। কারণ সম্পত্তির মালিক এখন নূতন অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কোথায় তার কত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে। আর কত টাকা পাওনা আছে লোকের কাছে। সেই পাওনা টাকার তালিকায় সুজয়ের নামও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারপর শুরু হবে সেই টাকার তাগাদা।

অবশ্য সুজয় কথা দিয়েছিল এই বছরে টাকাটা শোধ করে দেবে। কিন্তু বছরটা যে ধীরে ধীরে অনেকটা গড়িয়ে গেছে, আজ যেন তা বেশী করে ওর মনে হলো।

পরদিন অফিসে গিয়ে সুজয় ভাবল মাড়োয়ারীর কাছে টাকা চাইবে। নতুবা এতগুলি টাকা এই ক'দিনে কোথা থেকে সংগ্রহ করবে। আর কেই বা ওকে বিশ্বাস কোরে দেবে।

কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবল টাকার কথাটি কি তাকে বলা সঙ্গত হবে। টাকা পয়সা চাইলেই যে মানুষের প্রীতি বা সোহার্দ্যের সম্পর্কটুকু যেন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু সুজয় অন্য কোন পথ খুঁজে পেলো না। তাই মনে মনে সেই সিদ্ধান্তই অপরিবর্তিত রয়ে গেলো।

বেলা দুটো নাগাদ মাড়োয়ারী অফিসে এলো। আগে ঠিক দশটায় আসতো। এখন সুজয় আসবার পর থেকে সময়টা অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। কারণ এখন আর তাড়াতাড়ি আসবার তেমন প্রয়োজন হয় না

একটি পুরনো ফাইল বের করে মাড়োয়ারী বলল—কানপুরের একটা পুরনো পার্টি কোটেশান চেয়ে পাঠিয়েছে। লাস্ট ইয়ার একবার মাল নিয়েছিল। আগের রেটটা দেখে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন বাবু।

সুজয় অন্যমনস্ক ছিল। তাই সব কথা শুনতে পেলো না।

মাড়োয়ারী তা লক্ষ্য কোরে কিছুক্ষণ পরে বলল—কি ভাবছেন বাবু ?

আচমকা প্রশ্ন শুনে সুজয়ের মনটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। বলল—না শেঠজী, কিছু নয়।

মাড়োয়ারী কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তাই বলল—বাবু হামি ব্যবসা করি বলে কি মনের কথা একেবারে ভুলে যাই। তা নয় বাবু। হামিও মুখ দেখলে বুঝতে পারি। হামারও দিল আছে বাবু।

সুজয় আর গোপন করার চেষ্টা করল না। সমস্তটি বিষয় নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলল।

মাড়োয়ারী বলল—এরজন্য আপনি এত চিন্তা করছিলেন। হামাকে আগে বলেননি কেন ? আপনি কামিং সানডেতে দেশে চলে যান। আর ওদের পাওনা টাকা দিয়ে ডিডটা ফিরিয়ে আনুন।

সে দিনই মাড়োয়ারী একটি বিয়ারার চেক কেটে দিলো। পুরো তিন হাজার টাকা। যা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় এবং বিস্ময় কর।

তাই মেসে ফিরে সুজয় অনেকক্ষণ মাড়োয়ারীর কথা ভাবল। এই অল্পদিনে কি কোরে মানুষ এতটা আপন হতে পারে। যা তার জীবনের সব কিছু দিতে সঙ্কোচবোধ করে না।

অথচ সুজয় অন্য মানুষও দেখেছে। তারা অনেক কালের চেনা। তবুও তারা যেন গজ ফিতে নিয়ে বসে আছে। যতটুকু দেবে তার ষোলকলায় পুর্ণ করে নেবে। বিনা স্বার্থে কাজ করা যেন তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লোকসান।

## ॥ ১৭ ॥

শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে মিটে গেলো। শালুকপুরের সমস্ত লোকই নিমন্ত্রিত হয়েছিল সেদিন। আর এই ব্যাপারে খান্তু, ভ্যাবলা আর হারু যথেষ্ট সাহার্য করেছে নায়েব মশাইকে।

কাজের পরে একদিন তারিণীবাবু এলেন নায়েব মশাইয়ের সাথে দেখা করতে। আগেই তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার সাথে। তাই এক উত্তেজনা নিয়ে তারিণীবাবু বললেন—কাল রাত্রিতে সুজয় কলকাতা থেকে ফিরেছে। আজই সকালে টাকার জন্য তাগাদা দাও। দেখি বাছাধন এবার কোথায় পথ পায়।

কথাটি তারিণীবাবু বেশ তৃপ্তি সহকারে বললেন। যেন তিনি এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। এবার সুজয় বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে রাজী হবে। কারণ এমন আশ্বাস নায়েব মশাইও দিয়েছেন।

বাড়ী ফিরে তারিণীবাবু গিন্নীকে বললেন—এবার কাজটা হাসিল হয়ে এলো বলে।

পুঁটির মা উষ্মা নিয়ে বললেন—দরকার নেই এমন বিয়ে দেবার। বরং ভ্যাবলার সাথে বিয়েটা পাকা কোরে ফেলো। ওর মা তো আমাদের আশায় বসে আছে।

—দেখ গিন্নী ঐ ফাজিল ছোক্‌রার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে, একটি লেখাপড়া জানা ভাল ছেলের হাতে মেয়ে দিলে অনেক মঙ্গল হবে। একটু সবুর কর। দেখবে এবারই কিস্তিমাৎ করবো।

—লেখাপড়া জানলেই হবে। এদিকে যে ছেলের চালচুলো নেই। আর ভ্যাবলার সম্পত্তি দেখেছো তো। প্রায় সত্তর বিঘে ধানী জমি। নিজেদের পাকা বাড়ী। আবার শুনেছি পোষ্টাপিসেও মোটাটাকা জমানো আছে।

—দেখ তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না। আজ কাল যে দিন পরেছে, শুধু টাকা দিয়ে ছেলের বিচার করা যায় না।

—কেন ছেলে হিসেবে তো ভ্যাবলা একেবারে খারাপ নয়। শুনেছি খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে। আর স্বভাব চরিত্র তো আমি নিজের চোখেই দেখছি।

—তোমার ঐ চোখ আর এই বুদ্ধি নিয়ে ছেলে বিচার করতে যেও না পুঁটির মা।

পুঁটির মা এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাই গলা চড়িয়ে বললেন—আচ্ছা দেখা যাবে তোমার বুদ্ধির শান কতখানি। এই কোরে তো বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তো কিছু করতে পারলে না।

তারিণীবাবুর বাক্ শক্তি এবার মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তবুও বললেন—সেটা কি আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন সেটা তোমার মেয়ের ভাগ্য।

—তুমি অমন ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করো না। মেয়ে যাতে খুসী হয়, সেই চেষ্টাই করো। কারণ পুঁটি ভ্যাবলাকেই বেশী পছন্দ করে। সুতরাং রূপোর কাছে জোর করে সোনা আনবার কোন দরকার নেই।

*　　　　*　　　　*

সেদিন দুপুরের দিকে নায়েব এলেন সুজয়দের বাড়ীতে। সুজয় তখন ঘরেই ছিল। নায়েবের ডাক শুনে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এক পলকে দেখে নিয়ে নায়েব মশাই বললেন—অনেকদিন পরে দেশে ফিরলে।

সুজয় বিনীত ভাবেই বলল—হ্যাঁ নায়েব মশাই, নূতন অফিসে ঢুকেছি। তাই ছুটি নেবার অনেক অসুবিধা।

—তা বেশ, নূতন চাকরিতে ঢুকেছো। আরো উন্নতি কর। কিন্তু বাবার ঋণের টাকার সম্বন্ধে কি করলে?

কথাটি সুজয়ের মনে যেন কাঁটার মত বিঁধল। তাই একটু গম্ভীর হয়ে সুজয় বলল—হ্যাঁ, এবার আপনাদের টাকাটা শোধ করে দেবো।

—আর কবে দেবে। আজই ব্যবস্থা কর না।

—হ্যাঁ নায়েব মশাই, আজই দেবো। চেক্ আমি তৈরী করে রেখেছি।

নায়েব মুখ বিকৃতি করে বললেন—চেক তৈরী করে রেখেছো তুমি। একথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আর তাছাড়া ক্যাশ টাকার সাথে চেকের কি সম্পর্ক। তোমরা ক্যাশ টাকা নিয়েছিলে। আমাকে—ও ক্যাশ টাকা দিয়ে দেনাটা মিটিয়ে দাও।

নায়েব মশাইয়ের এমন যুক্তিহীন আর অপমান সূচক কথায় সুজয় অত্যন্ত বিস্মিত হলো। কারণ এর আগেও টাকার ব্যাপারে দু'একবার সুজয়ের সাথে কথা হয়েছিল। কিন্তু কখনও নায়েব মশাই এমন নীচু সুরে কথা বলেন নাই। তাই আজ আকস্মিক এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সুজয়ের সম্মানবোধটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

তাই সুজয়ও ভেতরে এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল—চেক যদি না নেন, তাহলে ক'দিন অপেক্ষা করুন। চেক ভাঙ্গিয়ে আপনার টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু নায়েব মশাই এতে শান্ত হলেন না। বললেন—আর ক'দিন এভাবে ধাপ্পাবাজী দিয়ে চলবে! তোমার উপর আমার অনেক বিশ্বাস ছিল। আর তুমি সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এতদিন আমাকে ঘুড়িয়েছ। আর নয়। এবাব আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

সুজয় আর সহ্য করতে পারল না, কপালের শিরা দুটো যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল। পায়ের নীচের মাটিটা যেন বার কয়েক টলে উঠল। আর এক বিষম ক্রোধে মুখের রঙ্ ওর লাল হয়ে উঠল।

তবুও কোনরকম সংযত হয়ে বলল—আপনি অন্যায় ভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। এতদূরের পথ বলেই আমি চেক

ভাঙ্গিয়ে আনিনি। কারণ আজকাল রাস্তা ঘাটের অবস্থা আপনি ভাল করেই জানেন।

—থামো তুমি। তোমার মত লম্পট....।

কথাটি তার শেষ হলো না। সুজয় যেন কতকটা জ্ঞানশূন্য হয়েই নায়েব মশাইয়ের বুকের জামাটা চেপে ধরল।

দরজার পাশে তখন সুজয়ের মা দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন। তিনি ত্রস্ত পদে বেরিয়ে এসে বললেন—কি হচ্ছে খোকা? এমন উত্তেজিত হওয়া তোমার সাজে না। উনি যা বলছেন, তাই চুপ করে শুনে যাও।

সুজয় মুহূর্তে নায়েব মশাইকে ছেড়ে দিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন মার উপস্থিতি আর কথায় ভয়ানক ও লজ্জা পেয়েছে।

কিন্তু নায়েব মশাই ছাড়া পেয়ে তুমুল গর্জে উঠলেন। তাই চিৎকার কোরে বললেন—এই অপমানের শোধ আমি তুলবো। এতবড় স্পর্দ্ধা! প্রজা হয়ে মনিবের গায়ে হাত তোলা!

সুজয় আর কোন জবাব দিলো না। আর জবাব দেবার মত সামর্থ যেন ও হারিয়ে ফেলেছে। তাই একবার চেয়ে দেখল মার মুখের দিকে। তারপর অধোবদনে এক অস্বস্তি নিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে গেল ঘরের ভিতর।

বিকেলের দিকে সুজয় তনুদের বাসায় গেল। এই ক'মাসের ব্যবধানে তনু যেন অনেকটা বদলে গেছে। আর আগের সেই দুষ্টুমিভরা মনটা যেন অনেক শান্ত হয়েছে। তাই সুজয় যখন ছোট একটা ব্যাট আর একটা বল তনুর হাতে দিলো, তনু তেমন আশাতীত আনন্দ প্রকাশ করলো না। শুধু বলল—তুমি আবার চলে যাবে সুজয়দা?

—না, এখন ক'দিন থাকবো; তুই যাস কিন্তু আমাদের বাড়ী।

তনুর দিদি তখন রান্নাঘরে ছিল। বাইরে সুজয়ের গলা শুনে সে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তারপর সুজয়কে দেখে খুশী মনে বলল—কবে এলে সুজয়দা?

—গতকাল।

—থাকবে তো কদিন?

—হ্যাঁ, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—বসো একটু চা করে দিই।

সুজয় আপত্তি করল না।

চা দিয়ে তনুর দিদি বলল—আচ্ছা সুজয়দা, কলকাতা যাবার সময় একবার দেখা করে গেলে না কেন? দেখা করে গেলে কি কোন দোষ হতো?

সুজয় মৃদু হেসে নিরুত্তর রইলো।

প্রসঙ্গ পালটে তনুর দিদি আবার জিজ্ঞাসা করল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সুজয়দা। ঠিক বলবে তো?

—আমার কি কোন গোপন কথা আছে নাকি?

—কি করে বুঝবো।

—কেন? এতদিন যেমন দেখে এসেছিস।

—তা ঠিক। কিন্তু একটা ব্যাপার যেন আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।

সুজয় এবার বিস্ময়ে বলল—কি বলছিস আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

—আচ্ছা, মানসীর সাথে তোমার কেমন আলাপ হয়েছিল?

—মুহূর্তেই সুজয়ের মুখটা কঠিন হয়ে উঠে। তাই পরক্ষণে বলল—কেন, সে কিছু বলেছে তোকে?

—না, তবে সেদিন নিজ থেকে বাসায় এসে তনুকে কতগুলি খেলনা দিয়ে গেল। তারপর আমার সাথে আলাপ হলো। সত্যি চমৎকার মেয়ে, বোধহয় লেখাপড়ার গুণে এত সুন্দর হয় মানুষ।

—কিন্তু এর সাথে আমার কি সম্পর্ক দেখলি?

—দেখিনি সত্যি। তবে অনুমানে কিছু বুঝেছি সুজয়দা।

সুজয় এবার কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলো। ও ভেবেছিল মানসী বোধহয় ঋণের টাকার সম্বন্ধে কিছু বলেছে ওকে।

তাই সুজয় এবার নিশ্চিত হয়ে বলল—তোর অনুমান মিথ্যে। তেমন কোন অবস্থা হয়নি আজও। আর এ কখনও সম্ভব নয়।

—কেন ?

—সে তুই ভাল করেই জানিস। আর এও জানিস আমাদের বাড়ীটা ওদের কাছে বন্ধক রয়েছে। এটা যে আমার কাছে কতখানি অপমান তা বোধহয় তুই বুঝবি না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো তনুর দিদি। তারপর বলল—তোমার মনের অবস্থা যাই হউক সুজয়দা। কিন্তু সেদিন মানসীর সাথে কথা বলে আমার কিন্তু অন্য ধারণা হয়েছে। আর এও আমি স্পষ্ট বুঝেছি, মানসী মনে প্রাণে তোমাকেই খুঁজছে।

কথাটি শোনামাত্র সুজয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কিন্তু তা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলল—তেমন কোন অবস্থা আজও লক্ষ্য করিনি। তবে বড় লোকদের খেয়াল। মনটা তাদের একটু অন্য ধরণের হয়। তাই অকারণে তারা একটু অনুকম্পা প্রকাশ করতে চায়।

সন্ধ্যে তখন হয়ে এসেছে। এক ঝাঁক বন টিয়া উড়ে গেল খুব নীচু দিয়ে। সুজয় একবার সেদিকে তাকিয়ে বলল—আজ উঠিরে। মাসিমার সাথে দেখা হলো না। মাসিমাকে বলিস, আমি দেখা করতে এসেছিলাম।

কাঁচা পথ ধরে সুজয় বেশ দ্রুত হাঁটছিল। এখন দেখা করতে যাবে ভবতারণবাবুর সাথে। তারপর দেখা করবে বন্ধুদের সাথে। অবশ্য বন্ধু বলতে এখন শুধু খাদু আর ভ্যাবলাই আছে। হারু চাকরি নিয়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়।

কাঁচা পথের এক বাঁকে এসে সুজয়ের গতি মন্থর হয়ে গেল। ও স্পষ্ট দেখতে পেলো মানসী ঠিক বিপরীত দিক থেকে আসছে।

কাছাকাছি হতে মানসী স্মিত মুখে হাত তুলে নমস্কার দিয়ে বলল—আপনার বাড়ী থেকে আসছি।

সুজয়ের ভিতর যেন কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হলো। তাই বেশ গম্ভীর গলায় বলল—আপনি আবার এলেন কেন? আমি তো সব বলে দিয়েছি নায়েব মশাইকে।

বিস্মিত হয়ে মানসী বলল—কি বলে দিয়েছেন?

সুজয়ের তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বোধ তখন অসহিষ্ণুতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাই উত্তেজনায় মানসীর এই বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করতে পারল না। উপরন্তু বলল—তাকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। সেই সমস্ত বলবে। এই বলে সুজয় যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানসী কঠিন স্বরে বলল—দাঁড়ান।

পেছন ফিরে সুজয় বলল—বলুন।

—আপনার ব্যবহার অত্যন্ত নীচ। আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। যেহেতু আপনাদের ঋণের টাকাটা আমি সময় মত শোধ করতে পারিনি। সুতরাং আমার আর সম্মান বোধ না থাকাই উচিত। তাই আপনারা যা খুশী তাই বলবেন।

মানসীও উত্তেজনায় তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল তাই কথাগুলি শুনলেও যেন বোঝবার মত মন ওর ছিল না তাই আগের মত দৃঢ়ভাবে বলল—হ্যাঁ, যিনি সময় মত ঋণ শোধ করতে পারেন না, তার আর আত্ম সম্মান বোধ না থাকাই উচিত।

একেবারে চরম আঘাত দিয়েছে মানসী। তাই এক অসহনীয় মানসিকতা আর স্থির দৃষ্টি নিয়ে সুজয় বলল—আপনি আর কিছু বলবেন?

মানসীও অনুরূপ তাকিয়েছিল সুজয়ের দিকে। এই প্রথম ওদের এত সান্নিধ্যে পরস্পর তীব্র ভাবে দেখা। তাই দু'জনার চোখেই যেন চরম বোঝাপড়ার ভাব।

কিন্তু বিধাতার অপরূপ এক বিধান। তাই এই অগ্নি দৃষ্টির বিনিময়ে

যেন রূপ পেলো অন্য জগতের। এতদিন যে দেখা হয়েছিল তা শুধু এক পক্ষ থেকে। তাই আজ এই উত্তেজনার চরম মুহূর্তে যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল, তা যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল।

আর এই মুহূর্তে সমস্ত দেহ মনের জটিলতার ঊর্দ্ধে ফুটে উঠল দু'টি হৃদয়। কোমল, স্নিগ্ধ, অপরূপ এক দৃষ্টি নিয়ে। মান, অভিমান, সম্মান কোন মানসিকতার স্থান নেই। শুধু অসীম নীল আকাশের নীচে প্রশান্ত নির্জনতায় দুটি হৃদয় যেন পরস্পর অতি কাছে দেখা।

দুজনেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মানসীর বিহ্বল ভাব কাটার পর নিজেকে সামলে নিল। সুজয়ও সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তারপর দুজনেই কোন কথা না বলে এক গভীর আচ্ছন্নের মত বাড়ী ফিরে গেল।

## ॥ ১৮ ॥

ঘরে ঢুকে মানসী প্রথম খোঁজ করল নায়েব মশাইয়ের। নায়েব মশাই তখন কথা বলছিলেন তারিণী বাবুর সাথে। বেশী নীচু গলায় নায়েব মশাই বলছিলেন—আজকের ব্যাপারটা বড় গোলমাল হয়ে গেল তারিণী। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আরে অত ভয় পাবার কি আছে। তুমি তো আর অন্যায় ভাবে কিছু বলনি। টাকা পাও, তাই তাগাদা দিয়েছ।

—না তারিণী ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমি যেন একটু বেসামাল হয়ে কথা বলে ফেলেছি। এটা ঠিক আমার উচিত হয়নি। হাজার হলেও সুজয় কর্তাবাবুর বন্ধুর ছেলে তো।

—তুমি রাখো দেখি এ সমস্ত কথা। এতদিন নায়েবী করে এই সামান্য বুদ্ধির পাকটুকু হজম করতে পারছ না। বন্ধু তো শুধু তোমার কর্তাবাবুর নয়। আমারও সে বন্ধু ছিল। কিন্তু আমাকে যে প্রয়োজনে এই ব্যাপারটা করতে হচ্ছে।

কিন্তু তবুও নায়েব মশাইয়ের মনটা স্বাভাবিক হতে পারল না।

ইতিমধ্যে মানসীর ডাক শুনে, নায়েব মশাই ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে গেলেন মানসীর দিকে।

মানসী জিজ্ঞাসা করল—আপনি টাকার জন্য সুজয় বাবুকে কিছু বলেছেন ?

—হ্যাঁ মা, আজই দুপুরে টাকার জন্য তাগাদা দিয়েছি। সেই কবে তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। আজ পর্যন্ত দেবার নাম নেই। আজ দেবো, কাল দেবো, এই করেই দিন কাটাচ্ছে। দেখি এবার টাকাটা না দিলে উকীলের চিঠি ছাড়বো।

তারিণীবাবু তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। আর মনে মনে ভাবছিলেন—যাক এবার তাহলে মানসী নিজেই টাকার জন্য তাগাদা দেবে।

কিন্তু মানসী গম্ভীর ভাবে বলল—সেখানে তাগাদা দেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না কেন ?

—এতে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে মা। পাওনা টাকা, তাই তাগাদা দিয়েছি।

—বাবা তো আপনাকে ঐ টাকার জন্য তাগাদা দিতে বারণ করে গেছেন। আপনি আবার কেন ঐ টাকার জন্য বলতে গেলেন।

নায়েব মশাই এবার লজ্জা পেলেন। কারণ দীর্ঘদিন কাজ করে এমন অভিযোগ তাকে কোন দিনই শুনতে হয়নি। কিন্তু আজ তারিণী চক্রবর্ত্তীর কূট চক্রান্তে তিনি নিজেকে যে ভাবে জড়িয়েছেন, তাতে লজ্জা আর অপমানে নিজেকে অত্যন্ত ছোট বোধ করলেন।

তাই এক গভীর অনুতাপে নায়েব মশাই আর মিথ্যার আশ্রয় নিলেন না। তিনি অসঙ্কোচেই বললেন—দেখ মা, ব্যাপারটা ঠিক টাকার জন্য নয়। এর পেছনে আরেকটি কারণ আছে। যেটা তোমাকে না বললে, তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।

—তাহলে আপনি খুলেই বলুন সেই কারণটা ?

—তারিণী চক্রবর্ত্তীর একটি মেয়ে আছে। তুমি বোধ হয় তাকে

দেখেছ। তারিণীবাবুর ইচ্ছে তার মেয়ের সাথে সুঞ্জয়ের বিয়ে দেয়। আর তার সাথে আমাদের পাওনা টাকাটা যৌতুক হিসেবে তারিণীবাবু মিটিয়ে দেবে বলেছে।

কিন্তু সুজয় এই বিয়েতে রাজী নয়। তাই ভাবলাম টাকার জন্য চাপ দিয়ে, যদি বিয়েটা করানো যায়। তাহলে সেও ঋণ থেকে মুক্ত হয়। আর আমরাও টাকা গুলো পেয়ে যাই। আর তার সাথে তারিণীবাবুও কন্যা দায় থেকে মুক্ত হয়।

কথাশুনে মানসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। মুহূর্তেই যেন ওর মনে ভাবান্তর হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে মানসী বলল—কিন্তু এটা তো আপনার অন্যায়। এমন হীন ষড়যন্ত্র কোরে বিয়ে দিলে কেউ যে কোনদিন সুখী হবে না।

নায়েব মশাই চুপ করে রইলেন।

মানসী বলল—বাবা মারা যাবার সময় বলে গেছেন, ওদের দলিলটা যেন আমরা বিনা টাকায় ফিরিয়ে দিই। আমিও বাবাকে বলেছিলাম—সেটা আমি ফিরিয়ে দেবো। আপনি কালই দলিলটা সুজয়বাবুর হাতে দিয়ে আসবেন।

—তুমি যা বলবে, তাই হবে মা।

তারিণীবাবু আড়ালে সবটুকু শুনলেন। তারপর বজ্রাহতের ন্যায় বেড়িয়ে এলেন দত্ত বাড়ী থেকে।

পথে ভ্যাবলার সাথে তারিণী বাবুর দেখা হলো। ভ্যাবলা তার রোষ দৃষ্টি এড়াবার জন্য দ্রুত পথ চলতে শুরু করল। কিন্তু তারিণী-বাবু তা আর হোতে দিলেন না। গলায় মধু মাখিয়ে ভ্যাবলাকে বললেন—কেমন আছ তুমি ভ্যাবলা? আজকাল তো তোমায় দেখতে পাই না?

ভ্যাবলা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল—হ্যাঁ মেসোমশাই আজকাল বাড়ী থেকে খুব কমই বের হই।

তারিণীবাবু সস্নেহে বললেন—আমাদের বাসায় যেও। সামনের

শনিবার সত্য নারায়ণের সিন্নী আছে। তোমার মাসিমা বারবার বলে দিয়েছে যেতে।

ভ্যাবলা সত্যি এবার অবাক হলো। কারণ এরচেয়ে অবাক হবার কারণ ওর জীবনে যে আর কিছু নেই। তাই বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল তারিণীবাবুর ক্লান্ত পদক্ষেপের দিকে। আর পরমুহূর্তেই উল্লাসের এক প্রচণ্ড আবেগে লাফ দিয়ে দৌড় দিল বাড়ীর দিকে।

## ॥ ১৯ ॥

সেদিন সুজয় বাড়ী ফিরে গিয়েছিল অন্যমনস্ক ভাবে। মানসীর বিহ্বল দৃষ্টি সুজয়কে অনেকটা স্পর্শ করেছিল। বাসায় ঢুকতেই মা বললেন—কোথায় গিয়েছিলি? সুরেন বাবুর মেয়ে এসেছিল দেখা করতে।

কি সুন্দর হয়েছে কথা-বার্ত্তায়। বলল, কাল কলকাতায় চলে যাবে। আবার কবে ফিরবে ঠিক নেই। তাই আজ দেখা করতে এসেছিল।

সুজয় কিন্তু কথাগুলো খুব স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারল না। তাই মার দিকে তাকিয়ে বলল—আর কিছু বলেছে?

—না। তবে কি যেন বলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলল না।

সুজয় উপেক্ষা করে বলল—আবার কি বলবে! বোধহয় টাকার কথাই বলতে এসেছিল।

—টাকার কথা ও বলতে আসবে কেন। সেটুকু জ্ঞান ওর হয়েছে। বড় চমৎকার মেয়ে। যাবার সময় প্রণাম করে বললে—বড় নির্জন জায়গা মাসিমা। সব সময়েই বাবার কথা মনে পড়ে। তাই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

পরদিন প্রত্যুষে নায়েব এলেন সুজয়ের বাড়ীতে। এত সকালে নায়েবকে আসতে দেখে সুজয় অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই নায়েব মশাই কাগজে মোড়া বাড়ীর দলিল খানি সুজয়ের হাতে দিলেন। তারপর ক্ষুন্নমনে বললেন—কালকে আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছে বাবা। এই বুড়ো লোকটার দোষ নিও না। কর্তাবাবু মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, বিনা টাকায় তোমাদের দলিলটা যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার সেটা জানা ছিল না। কাল রাত্রিতে মানসী মা সে কথা বলল। তাই আজ তোমায় দলিলটা ফিরিয়ে দিতে এলাম।

—তা হয় না নায়েব মশাই। এই ব্যাপার নিয়ে গতকাল যে ঘটনা হয়ে গেছে, তাতে আর এমন প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না। আপনি দলিল খানি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমি নিজেই টাকা দিয়ে দলিল খানি নিয়ে আসবো।

নায়েব মশাই বুঝতে পারলেন সুজয়কে সহজে রাজী করতে পারবেন না। তবুও বললেন—এই দলিল খানি যদি তুমি না রাখো, তাহলে চিরদিনের জন্য আমি দোষের ভাগী হয়ে থাকবো। আর এই বুড়ো বয়সে বোধকরি তুমি আর আমাকে এই শাস্তি দেবে না।

সুজয় এবার আর রূঢ় কথা বলতে পারল না। নায়েব মশাইয়ের ভারী গলা আর বিনীত কথায় যেন ওর মনটা টলে উঠল। তাই বলল—কিন্তু এমন অযাচিত দান আমি নিই কি কোরে বলুন তো?

—সে তুমি ইচ্ছে করলেই পার সুজয়। আর আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করো না।

—আচ্ছা, আপনি এখন দলিল খানি নিয়ে বাড়ী যান। আমি একটু পরেই মানসী দেবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

—কিন্তু সেতো পিসিমাকে নিয়ে আজ ভোরের ট্রেনে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে। আর আমিই তো আসবার মুখে তাদের তুলে দিয়ে এলাম।

এবার যেন সুজয় কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পরক্ষণে বলল—আপাতত আপনার কাছেই ওটা রাখুন। কলকাতায় গিয়ে আপনাকে চিঠিতে সব জানাবো।

—তা হয় না বাবা। তুমি যখন কলকাতায় যাবে। তখন তুমিই বরং মানসীর সাথে দেখা কোরে কথা বলো। আমি তাকে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে দেবো।

অগত্যা তাই স্থির হয়ে রইলো। আর নায়েব মশাইও খুশী মনে বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু সুজয়ের মা বললেন—দলিল খানি নিয়ে নিলেই পারতিস খোকা। অত করে যখন বললেন।

—তা হয় না মা। এতদিন যখন তাগাদা দিতে পেরেছে। আর আজই বা হঠাৎ এত করুণা দেখাবার কি প্রয়োজন। তাছাড়া টাকাটা যখন জোগাড় হয়ে আছে, তখন শুধু শুধু কেন অপরের টাকা নেওয়া।

* * *

তারপর সুজয় কলকাতায় মাকে নিয়ে ফিরে এলো। আগে চিঠি দিয়ে বটুক বাবুকে ঘর ঠিক রাখতে বলেছিল। তাই ঘর পাওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি। সোজা মেসে না উঠে ভবানীপুরের বকুল বাগানের একটি ভাড়া করা বাড়ীতে গিয়ে উঠল।

বেশ বড় বড় আলো বাতাস যুক্ত দু'খানি শোবার ঘর। পায়খানা, বাথরুম সব আলাদা। আবার সামনের দিকে ছোট একটু বাগান। বাগানের দুইদিকে গুটি কয়েক ছোট ছোট ঝাউ গাছ। বোধহয় বছর দুয়েক লাগানো হয়েছে গাছগুলো।

তাই সুজয়ের মা খুসী মনে বললেন---ভদ্রলোকতো বেশ সুন্দর বাড়ী করেছেন।

সুজয় মার কথায় সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের রুচি আছে। তবে যে বাড়ীটি আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন, তার কথা কিন্তু ভুলে যেও না মা।

—তার কথা কেন ভুলবো। সে তো তোরই মত।

পাশে তখন বটুকবাবু ছিলেন। তিনি বললেন—না, মাসিমা। এই অধমের কথা ভুলে থাকবেন। নইলে কিন্তু পরে এসে সব সময় জ্বালাতন করবো।

—বেশ তো, তাই করো।

দিন কয়েক পরে দীননাথবাবু এলেন বটুকবাবুর সাথে। সাজানো গুছানো ঘর দু'খানি দেখে তিনি আর প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। তবে একটা ব্যাপারে সুজয়কে বললেন—সব জিনিষই এনেছ সুজয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে এখনও অন্ধকারে পড়ে আছ। আর সেই জিনিষ না আনলে এই ঘরের অন্ধকার কোনদিনই ঘুচবে না।

সুজয়ও চুপ থাকেনি। নিছক কথা বলে পরিবেশটাকে লঘু কোরে তুলবার জন্য বলল—কেন ওরা কি পৃথিবীর সব আলো নিয়ে বসে আছে। ওরা না এলে কি ঘরের আলো কোনদিনই জ্বলবে না।

প্রত্যুত্তরে দীননাথবাবু যেন এবারে গভীরে চলে গেলেন। তাই তিনি বললেন—সেই ঘরের আলো জ্বলবে না কেন? তা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম এক উৎকর্ষতার পরিচয়। তবে সেই আলো বাইরের অন্ধকারকেই দূর করতে সক্ষম। মনের গহন অন্ধকারে সেই আলো যাবে কি কোরে?

ইতিমধ্যে সুজয়ের মা খাবার তৈরী করে আনতে গেলেন। তাই বটুকবাবু বললেন—ওটা দাদা মনেরই এক দুর্ব্বলতা। তাছাড়া আর কিছু নয়।

—তুমি মিথ্যে বলছ বটুক। এই ঘরের আলোর অভাবেই তোমার মুখের হাসি অনেক নিভে গেছে। এখন তুমি যে হাসো, তা শুধু নির্জীব আর নিস্তরঙ্গেরই হাসি। এতে তোমার প্রকাশ আছে। কিন্তু বিকাশ নেই। আর নেই সেই উচ্ছল প্রাণের এক প্রমত্ত মাতোয়ারা।

বটুকবাবু একেবারে ঠাণ্ডা। সামান্য রসিকতা করতে গিয়ে এই কি আত্মসমালোচনা শুনলেন। হাসির প্রকাশ আছে। কিন্তু বিকাশ নেই। প্রাণ আছে। কিন্তু প্রাণের মাতোয়ারা নেই। আছে শুধু নির্জীব আর নিস্তরঙ্গেরই কতগুলি ইঙ্গিত।

এত সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনে বটুক বাবু যেন অথৈ জলে পড়লেন। কি ভুল করেই যে তিনি মুখ খুলে ছিলেন। আর এখন তিনি এমন কি উপযুক্ত জবাব দেবেন।

কিন্তু ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন ছিল। তাই ইতিমধ্যে সুজয়ের মা খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বটুকবাবু খাবারের থালায় কাজু বাদাম আর সন্দেশ দেখে বললেন —মাসিমা শেয়ালকে এমন করে ভাঙ্গা বেড়া দেখাবেন না। পরে কিন্তু সামলাতে পারবেন না।

খেতে খেতে দীননাথবাবু বললেন—এর পরে যখন আসবো তখন যেন ছেলের বৌউকে দেখতে পাই। আর এই আশা নিয়েই আজ ফিরে যাবো।

—সেটা ওকে ভাল করে বলে যান।

—আমাদের যা বলার বলে দিয়েছি। এখন আপনি ভাল করে বলুন।

খাওয়ার পালা শেষ হতে দু'জনেই উঠে বিদায় নিল। সুজয় তাদের সাথে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। ফিরে এসে মাকে বলল—কেমন দেখলে মা ওদের দু'জনকে?

—দু'জনেই যেন এক প্রাণে গড়া। দিব্যি মানুষ। এমন লোকদের মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নেমন্তন্ন করিস।

॥ ২০ ॥

একদিন অফিস থেকে ফিরবার মুখে সুজয় মানসীদের বাসায় গেল। সঙ্গে অফিসের গাড়ীটি ছিল। এখন বেশীর ভাগ সময় সুজয়ই গাড়ীটি ব্যবহার করে। মাড়োয়ারী কদাচিৎ নিজের প্রয়োজনে গাড়ীটি নেয়।

গেটের সামনে গাড়ীটি দাঁড় করিয়ে, সুজয় বার কয়েক হর্ণ বাজালো। শব্দ শুনে পিসিমা জানালা দিয়ে দেখলেন—একজন পুরুষ গাড়ীতে বসে আছে। কিন্তু তিনি ঠিক উপর থেকে চিনতে পারলেন না। তাই বিস্ময়ে তিনি মানসীর দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখতো একজন কোট প্যান্ট পরা ভদ্রলোক মনে হলো।

মানসীও একটু আশ্চর্য্য হয়ে নীচে নেমে এলো। সুজয় তখন গাড়ীর দরজা খুলে নীচে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানসীকে দেখে সুজয় আজ এই প্রথম নমস্কার জানিয়ে বলল—এক প্রয়োজনে আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। আপনার সময় হবে কি আমার কথা শুনবার?

মানসীর বুকটা বার কয়েক কেঁপে উঠল। কোন ভয় বা অজানা আশঙ্কায় নয়। আকস্মিক সুজয়ের আবির্ভাবে ও যেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারছিল না!

তবুও কোনরকম নমস্কার জানিয়ে বলল—ভেতরে আসুন।

সুজয় কথা শুরু করবার আগেই মানসী বলল—সেদিনকার ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত

—না, এতে দুঃখিত হবার কি আছে। আপনি উচিত ভাবেই কথা বলেছিলেন।

মানসীর মুখটা বিবর্ণ হলো। বুঝতে পারল সুজয় সেদিনকার ব্যাপারটা আজও ভুলতে পারেনি।

—যাক্ সে কথা। আপনাদের টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্য আজ এসেছি।

—আপনি তো সব শুনেছেন নায়েব মশাইয়ের কাছ থেকে।

—না তা হয় না। এটা যে আমার পিতৃঋণ। নইলে আমি চিরদিনই অসুখী থাকবো।

—কিন্তু বাবা তো টাকাগুলো ঠিক ঋণ হিসেবে দেননি। আর বাবা মৃত্যু শয্যায় বলে গেছেন, আমি যেন বিনা টাকায় দলিলটা ফিরিয়ে দিই।

সুজয় এবার চুপ করে রইলো। যেন এতদিনের মনের পুরণো কাল মেঘটা ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল।

মানসী আবার বলল—বাবা আপনাদের আপন জনের মত দেখেছেন। আমিও আপনাকে আপন জনের মত দেখি। আপনি কেন এতদূরে সরে যেতে চাইছেন ?

কথাটি যেন অতর্কিতে আন্তরিক ভাবে বলে ফেলল মানসী। আর সুজয় চেয়ে দেখল, মানসীর মুখটি ম্লান হয়ে এসেছে। কাজলটানা চোখ দুটিতে যেন নিঃসঙ্গতার জল এসেছে।

অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব রইল। বাইরের দিনের আলো মুছে গেল। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ তখন আকাশে। এমনি সময় পাশের বাড়ীর রেডিও থেকে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে এলো। মানসীর দৃষ্টি আর মন যেন আরো বিহ্বল হয়ে পড়ল।

গান শেষ হলো। সুজয় এতক্ষণ মুগ্ধ হয়েই বসেছিল। তারপর তাকাল মানসীর দিকে। মানসী বিনম্র মুখখানি নত করল।

* * * *

পরদিন সুজয় যথারীতি অফিস গিয়েছে। কিন্তু কাজেতে তেমন মন দিতে পারল না। অনাবশ্যক ভাবে কতকগুলি ফাইল নাড়াচাড়া করল। তারপর সেগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবতে লাগল গতকালের ঘটনাটি।

মানসী আন্তরিক ভাবে যে কথাটি বলেছিল। তা যেন সুজয় আবার শুনতে পেলো। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল মানসীর করুণ জলভরা চোখ দুটি।

এমনি সময় একটি বেয়ারা কতগুলি চিঠি নিয়ে এলো। চিঠিগুলি খুব প্রয়োজনীয়। কয়েকটি অফিস থেকে কতগুলি জিনিষের কোটেশন চেয়ে পাঠিয়েছে। তাই এইগুলি বেশ বিবেচনা করেই উত্তর দিতে হবে।

সুজয়ের ভাল লাগল না এই মুহূর্তে কোন অফিসের কাজ করতে। তাই চিঠিগুলি পেপার ওয়েট দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল। কিন্তু অফিসের আরেক ভদ্রলোক বললেন—চিঠি দেবার শেষ তারিখ আজই। নইলে কোন কাজ হবে না স্যার।

সুজয় কিঞ্চিৎ রুষ্ঠ হলো। কিন্তু তবুও চঞ্চল মনটা শান্ত হলো না। তাই সুজয় বলল—আপনি একটু ভেবে কোটেশনটা দিন। আজকে আমি একটু আনইজি ফিল করছি।

পাঁচটা বাজলো। সুজয় অফিসের বাইরে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীটি আজ নেই। মাড়োয়ারী গাড়ী নিয়ে আসানসোল গেছে। তাই সুজয় ভীড়ে বাসে না উঠে হাঁটতে শুরু করলো কলেজষ্ট্রীটের দিকে। সেখান থেকে খান কয়েক বই কিনে বাসেই ও বাড়ী ফিরবে।

কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে সুজয় থমকে দাঁড়ালো। বিপুল বিস্ময়ে দেখল, মানসী একটি কাপড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। আর হাতে ওর একটি কাপড়ের বাক্স।

মানসীও অনুরূপ বিস্ময়ে দেখল সুজয়কে। মানসী আশা করতে পারেনি এভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। তাই মানসী প্রথমে বলল—পিসিমার জন্য কাপড় কিনতে এসেছিলাম।

পরক্ষণে মানসী আবার প্রশ্ন করল—এই বুঝি অফিস থেকে ফিরছেন ?

—হ্যাঁ।

—চলুন আমাদের বাসায়। সেইখানেই আজ বিকেলের জল খাবার খাবেন।

সুজয় আপত্তি করেনি। তাই দু'জনেই একসাথে গাড়ীতে গিয়ে বসল। তারপর বেশী সময় লাগেনি। মাঝপথে শুধু ড্রাইভারটি সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করল—দিদিমনি গাড়ী কোথায় যাবে ?

মানসীর ইচ্ছে হলো গাড়ীটিকে ঘোড়াবার। যেন আরো কিছুটা নূতন পথ দিয়ে ঘুরে আসে আজ। কিন্তু লজ্জায় আর সে কথা বলা হলো না। তাই গাড়ী শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে এসেই পৌঁছল।

পিসিমা সুজয়কে দেখে খুব বিস্মিত হলেন না। তিনি বরাবরই এমন আশা করেছিলেন। তাই হাসি মুখে সুজয়কে বসতে বললেন। তারপর তিনি নিজেই খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

মানসী এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কথা বলার জড়তাও যেন অনেকটা কেটে গেছে। পাশের ঘরের দেরাজ থেকে একখানি চিঠি এনে সুজয়ের হাতে দিয়ে বলল—দিন কয়েক হলো চিঠিটা ব্যাঙ্ক থেকে এসেছে। আমার মনে হয় অ্যাকাউন্টস ট্রান্সফারের ব্যাপার কিছু লিখেছে। কিন্তু সই আমার ভয়ানক অমিল হয়। একাউন্টসটা আপনার নামেই ট্রান্সফার কোরে নিন।

এরপর কথা আর এগোল না। ভৃত্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। মানসী এগিয়ে গিয়ে খাবার গুলো টেবিলের উপর রাখল।

খান কয়েক মিষ্টি খেয়ে সুজয় ডিশটা সরিয়ে রাখল। ইতিমধ্যে পিসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন। ডিসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—কই কিছুই তো খেলে না সুজয়। আর দু'খানা খাও। নইলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করবো।

সুজয় কথা ফেলেনি। তাই পিসিমাকে সন্তুষ্ট করেই চেয়ার থেকে উঠল। দরজার কাছে এসে মানসী বলল—আপনি বেশ তো ? কোথায় থাকেন তার কোন ঠিকানা দিয়ে গেলেন না। দরকার হলে কি করে খবর দেবো।

সুজয় কথাটির গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করল। তাই আজ লঘু কারে বলল—আমিও ভাবছিলাম ঠিকানাটা সত্যি দেবার প্রয়োজন হবে কিনা।

মানসী কিঞ্চিৎ নিরুত্তাপেই বলল—বেশ তাহলে দেবেন না।

—এখন আর তা হয় না। একবার যখন চেয়েছেন, তখন আর না দিয়ে আবার অভদ্র ব্যবহারটা প্রকাশ করতে চাই না।

পরদিন বেলা চারটে নাগাদ টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল। সুজয় ফান ধরে বুঝল, মানসী কথা বলছে। আজ সন্ধ্যা ছ'টায় ওদের াসায় যাবার জন্য বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুজয় বাড়ী ফিরে গেল। একটা অনাস্বাদিত ানুভূতিতে সমস্ত মন আজ ওর উল্লাসিত। মা লক্ষ্য করে বললেন—াাজকে এত তাড়াতাড়ি চলে এলি। কোথাও যাবি বুঝি?

—হ্যাঁ মা একজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরতে একটু রাত তে পারে।

—কিন্তু আজ যে রাত্রিতে বটুককে খেতে বলেছিস। সে কথা কি ুলে গেছিস।

—ওকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত যেন চলে না যায়।

তারপর দ্রুত পোষাকটি পরিবর্ত্তন করে সুজয় যাবার জন্য প্রস্তুত লো।

মা এগিয়ে এসে বললেন— কি ব্যাপার বলতো? অফিস থেকে এসে াবারের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছিস।

ধরা পড়বার ভয়ে সুজয় তাড়াতাড়ি বলল—একদম খিদে নেই মা। কেবারে এসে খাবো।

তারপর সুজয় অফিসের গাড়ী নিয়ে মানসীদের বাসায় পৌঁছল। তক্ষণ মানসীও সুন্দর ভাবে সেজে অপেক্ষা করছিল। সুজয়কে দেখে নসী হেসে বলল—এই বুঝি ঠিক ছ'টায় এলে? সেখানে পৌঁছাতেই । অনেক রাত হয়ে যাবে।

সুজয় লক্ষ্য করল ভাষার দূরত্বটা আজ আর নেই। তাই সুজয় জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবে?

—আমার এক বন্ধুর বিয়ে আজ। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো।

সুজয় মৃদু হেসে বলল—কি বলে পরিচয় দেবে।

মানসী লজ্জা পেলো।

সুজয় এগিয়ে এসে মানসীর হাত ধরে বলল—পারলে না তো বলতে?

মানসী কতকটা সঙ্কোচ ভাব কাটিয়ে বলল—খুব পারবো। এখন চলতো তাড়াতাড়ি।

দু'জনেই গিয়ে গাড়ীতে উঠল। গাড়ীটি এক রাশি ধুলো উড়িয়ে দ্রুত গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর পিসিমা উপরের জানালায় দাঁড়িয়ে এক পরম আনন্দের হাসি হাসলেন।

শেষ